তামসপর্ণা

সুব্রত রায়

BIRCHAND PUBLIC LIBRARY
AGARTALA

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৯

পরিবেশক—করুণা প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

প্রকাশক—
শ্রীদেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
৩৭সি, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :—
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
প্রণব শূর

দাম—তিন টাকা

'তামসপর্ণা' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র এবং কাহিনীর সবটুকুই কাল্পনিক। যদি কেউ কোন বিশেষ চরিত্র বা নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পান—তবে তা সম্পূর্ণ আমার অনিচ্ছাকৃত বলে ধরে নিতে হবে।

—সুব্রত রায়

স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে আমার মায়ের অভাব যে পূরণ করেছে—আমার সেই দিদি শ্রীমতী প্রমীলা দেবীকে—

সুব্রত

মানুষ পৃথিবীতে হিসেব করে আসেনা। তাই, যখন আসে পৃথিবীর কোলে তখন হিসেব করে চলতে গিয়ে পদে পদে হিসেবে গরমিল হয়। এই তালে পড়ে কেউ হয় বেহিসেবি, জীবনটাকে খুঁজে পেতে চায় হিসেবের বাইরে। আর কেউবা জীবনটাকে বাদ দিয়ে দু'য়ে দু'য়ে 'চার'কে আঁকড়ে ধরে। তবু কি জানি কেন, হয়তো নিয়তি নামক কোন শক্তির অত্যাধিক চাপে পড়ে একদিন না একদিন পেছন ফিরে তাকায়। দেখতে চেষ্টা করে জীবন-খাতায় কি জমা পড়লো আর কি বিয়োগ। হয়তো এ মানুষের চিরন্তন অনুসন্ধিৎসা ইতিহাস রচনা করার। হয়তো কেন, তাই। তা না হলে মানুষ কেন তার প্রথম পুরুষের আবির্ভাবের দিনক্ষণ ঠিক করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে? তা ছাড়া এও হয়তো সম্ভব যে, যৌবনের দুরন্ত ছুটে চলাটা যখন বার্দ্ধক্যে এসে শ্লথ হয়ে পড়ে তখন পেছনে তাকাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, কতখানি ছুটে আসতে পারলো। যারা একছুটে জীবনের পথটুকু পেরিয়ে যায় তাদের কথা আলাদা। যারা রয়ে বসে জীবনের পথটুকু পেরয় তাদের কথাই বলা চলে। কেন না, তারাই তৈরি করে ইতিহাস।

দক্ষিণ কলকাতার অধ্যাপক সৌমেন্দু চট্টোপাধ্যায় সেই পরবর্তি সংখ্যার লোক। যারা রয়ে বসে পথটুকু পেরয়।

সৌমেন্দু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। মা বাবার অনেক আশা ভরসার স্থল ও। মা-বাবা আর ছোট্ট খোকা সৌমেন্দু এই তিনের সম্মিলিত সংসার—পরিপূর্ণ। ছোট্ট খোকাটিকে কি করে মানুষ করবে এই নিয়েই স্বামী-স্ত্রীতে যতটুকু মতবিরোধ। এ ছাড়া সংসারের অন্য সব জটিলতর প্রশ্নে এরা একে অন্যকে

নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল। সৌমেন ছোট্ট দুটো চোখকে অনেক বড় বড় করে মা-বাবাকে দেখতো। আজও তাকিয়ে আছে সামনের ছবিটার দিকে। মা-বাবার ছবি। বড় বড় চোখ করে তাকাবার মতো বয়েস নেই বলেই হয়তো ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আছে। শতাব্দির মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আজও যেন অনেক কিছু আবিষ্কার করার রয়ে গেছে মায়ের ছবি থেকে। বাবাকে বুঝতে পারতো ও। কিন্তু মা? এ যেন জানা না জানার এক বিরাট প্রহেলিকা। "তুমি যাই বলো আমি খোকাকে আই, এ, এস করবো।" "অফিসার বানাও আর কেরাণী বানাও চাকর তো বানাবে? ও সব চলবে না। খোকা আমার ব্যারিষ্টার হবে।

ভালো করে ছবিটার দিকে তাকায়। ছবির ঠোঁট গুলো নড়ে উঠলো কিনা দেখে।

"কিছুদিন পরে বিয়ে করলে কি আমরা তোকে বাধা দিতাম? তুই যে আমাদের একমাত্র আশা ভরসা এটা কি একবারও ভেবে দেখলি না?"

চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে সৌমেনের। আজ কেউ নেই। মা-বাবা তামসী কেউ না। ঘরের দেওয়াল গুলোয় চোখ বুলিয়ে নেয়। না তামসীর কোন চিহ্ন কোথাও নেই। থাক্‌তে দেয়নি ও। তামসী মারা গেছে এটাই সে অপর্ণাকে বুঝিয়ে এসেছে। কেন জানি মা বাবার কথা ভাবতে গেলে তামসীও পাশে এসে দাঁড়ায়। অথচ কি বেমানান! তাহলে কি সৌমেন কুড়ি একুশ বছরেও তামসীকে ভুল্‌তে পারেনি? বাইরে জুতোর শব্দে সৌমেন হাতের কাছে পাওয়া একটা বই খুলে পড়বার চেষ্টা করে।

—বাবা, তুমি আজ কলেজে যাওনি?

—না রে, আজ ক্লাশ নেই।

আর কোন প্রশ্ন না করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অপর্ণা। ঠোঁটের কোনে হাসি ফুটে ওঠে। 'কলেজ পালিয়েছ ত?

বেশ করেছ। চা খাবে? অর্ণব! বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এস।' সৌমেন্দু দরজার দিকে তাকায়।

—বাবা, এর নাম অর্ণব সেন। বিরাট ব্যবসায়ী। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এলাম।

—সিট ডাওন ইয়ং ম্যান। অর্ণব একটা সোফায় বসে। সৌমেন্দু অর্ণবের হাতের সিগারেটটার দিকে তাকায়।

—তোমরা বস, আমি একটু আসি। বলে, পাশের ঘরে চলে গেলেন। অপর্ণা অর্ণবকে বসতে বলে চা করতে চলে যায়। ওর বাবার চলে যাবার কারণ ও বোঝে। অর্ণবের বয়স্ক লোকের সামনে সিগারেট খাওয়াটা সহ্য করতে পারেন নি। অপর্ণার হাসি পায়। বাবাটা যেন সেকেলে। এত লেখাপড়া করেন, বিদেশের রীতিনীতি যার অজানা নয় সে কিনা সিগারেট খাওয়াই পছন্দ করে না। তবুত ভালো বর্ত্তমান সোসাইটিতে মদ খাওয়ার রেওয়াজ বাবা দেখেন নি। সেদিন ত অপর্ণা কি ভয়ই না পেয়েছিল প্রফেসর বোসের সঙ্গে প্রথম যেদিন ড্রিঙ্ক করেছিল। কিছু না, ছোট্ট এক পেগ মাত্র। তাতেই কেমন মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। মাথাটা ভার, পা যেন শোলার তৈরি; সব চাইতে বড় কথা কেমন যেন বমি বমি ভাব। আর—! না থাক। অপর্ণা আর এ সব ভাবতে চায়না। সেদিন পুরুষের সান্নিধ্য ওকে রোমাঞ্চিত করতো। ইচ্ছে করতো জড়িয়ে ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে। আর আজ? আজকাল মনে হয় গায়ের চামড়াটা মোটা। বেশ মোটা। বোর্ডে ও প্লাগটা লাগিয়ে দেয়। প্যাঁচানো তারগুলো আস্তে আস্তে লাল হতে থাকে। ডান হাতটা এগিয়ে দেয় লাল হয়ে ওঠা তার গুলোর দিকে। কেমন হয় হাতটা চেপে ধরলে হিটারের ওপর? পোড়া যায়গাটা কি আবার পুড়বে? হাতটা সরিয়ে আনে। কেটলি শুদ্ধু জল বসিয়ে দেয়। অর্ণব একা বসে আছে। থাকবে। তাড়ালেও এখন যাবে কি না সন্দেহ। থাক্। অর্ণবকে

ওর দরকার। একজন কেউ না থাকলে যেন সব ফাঁকা মনে হয়। পেছনের দিন গুলো সব হাঁ করে গিল্‌তে আসে। অর্ণবের পয়সা আছে। পয়সা না থাকলেই যেন পৃথিবীটা বিস্বাদ হয়ে যায়। লেখা পড়ায় একটু ভালো হলেই কি জানি কেন ছেলেগুলো সব আদর্শবাদী হয়ে ওঠে। কেউ বা সাহিত্যিক আর কেউ বা প্রফেসার। বাবার জন্যে করুণা হয়! কেন যে আদর্শবান হতে গেলেন, আর তারই পরিপূর্ণ বিজ্ঞাপন হিসাবে বেছে নিলেন শিক্ষকতা—ভাবতেও কেমন লাগে। তার ওপর মা চলে যাবার পর থেকে কেমন যেন ঘরকুনো হয়ে গেছেন। আবার বিয়ে করলেই ত পারতেন। তা না একজনের কথা ভেবেই সারা জীবন নষ্ট করা! হাসি পায় অপর্ণার এই বাবার মতো লোকদের কথা মনে পড়লে। খাবার পড়ে রয়েছে সামনে অথচ খাবে না। কারণ? আদর্শ। রাবিশ। জীবনের প্রতি, যৌবনের প্রতি যাদের অনীহা তাদের কাউকে কাছে পেলে অপর্ণা পরীক্ষা নিত লোকগুলো সত্যিই সংযমী না অক্ষম। আজও হাসি পায় অপর্ণার। নাম করা এক হোটেলের কেবিনে ওরা তিন জন কফি খাচ্ছিল। কেবিনের বাইরে এক সৌম্য দর্শন ভদ্রলোক বসে বসে চা খাচ্ছিলেন। ওরা তিন বান্ধবীতে মিলে কেবিনে ঢোকার সময় ভদ্রলোক এমন মুখভাব করলেন, যা দেখলে মনে হবে পৃথিবীতে কোন মেয়ে না থাকলেই উনি খুশী হতেন। অপর্ণা রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারেনি। তাই কফি আসার পর পর্দাটা একটু ফাঁক করে দেয়, যাতে ভদ্রলোক শুধু অপর্ণাকে দেখতে পায়। কেবিনেব দেয়ালের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে দেখে ভদ্রলোক আড় চোখে অপর্ণাকে দেখছে। অন্যমনস্কের মতো অপর্ণা বুকের ওপর জড়ানো আঁচলটা ফেলে দেয়। আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পায় ভদ্রলোকের দৃষ্টিটা অপর্ণার বুক বরাবর এসে থেমে রয়েছে। আস্তে আস্তে খুলে ফেলে ব্লাউজের বোতাম-গুলো। ভেতরের জামার পেছনের হুকটা খুলে দিয়ে একটু আলগা

করে জামাটা ওপর দিকে গুটিয়ে নেয়। আয়নায় দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারে বাইরের সৌম্যদর্শন লোকটির অজ্ঞান হওয়ার পালা। বান্ধবীরা অবাক হয় অপর্ণার ব্যবহারে। বিশেষ করে সোনালী। একটু হেসে আবার নিজের কাপড় ঠিক করে নিতে নিতে অপর্ণা বলে, "পরীক্ষা নিলাম।" হো হো করে হেসে ওঠে তিনজনেই। কেবিন থেকে ওরা দুজন আগে বেরিয়ে যায়, অপর্ণা পরে। ধীরে সুস্থে ভদ্রলোকের চেয়ারে অকারণ ধাক্কা মেরেই বেরিয়ে পড়ে। দেখে ভদ্রলোক পেছনেই। এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিয়ে সোনালীদের সঙ্গে চলে যায়। বাবাকে ঠিক সে পর্য্যায়ে টেনে আনতে পারলে খুশী হতো অপর্ণা, কিন্তু পারে না। পৃথিবীর সমস্ত লোকগুলোই যে খারাপ অথবা খারাপ হওয়ার প্রতীক্ষায় আছে এটাই অপর্ণা বিশ্বাস করে। তবুও কি জানি কেন বাবাকে সে দলে টেনে আনতে পারছে না। হয়তো নিজের বাবা তাই। এর সঙ্গে আর একজনকেও কেন জানি এ পর্য্যায়ে টেনে আনতে পারছে না। চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে মনে পড়ে যায় এমনি কত কিছু। ছোটঘরে বাবার চা-টা দিয়ে নিজেদের চা নিয়ে অন্য ঘরে গেল, যেখানে অর্ণব প্রতীক্ষা করে আছে।

—চা করতে এতক্ষণ লাগলো ?

—কি জানি হিটারটা খারাপ হয়েছে হয়তো, জল ফুটতে বড্ড দেরি হয়ে গেল।

—কই, আপনার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এলেন, অথচ—।

—বাবা ? হয়েছে, আপনিও যেমন।

—কেন ?

—যাক্‌গে এখন কোথায় যাবেন ঠিক করলেন ?

—চলুন যেখানে খুশী।

—মাইণ্ড ইট, আই শ্যাল হ্যাভ এ শিপ। হুঁ ?

—নিশ্চই, তাছাড়া আমারও গলাটা কেমন শুকিয়ে আছে

এক ঝলক বাতাসের মতো এসে আবার ফিরে গেছে। সৌমেন্দুর শামুকের খোলের ওপর সেই এক ঝলক বাতাস আঁচড় কাটতে পেরেছে কিনা বলা মুস্কিল। কেননা, অর্ণবের প্রথম আবির্ভাবে সৌমেন্দুর কতটুকু নির্লিপ্ততা ছিল, ওরা চলে যাবার পর তা বাড়লো কিনা আদৌ বোঝা যাবেনা। অপর্ণা জানে ওর বাবা সব কিছু থেকেই কেমন নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়, তাই ও মাঝে মাঝে চেষ্টা করে বাবাকে বিদ্রোহী করে তুলতে। অপর্ণার এরকম চলাফেরা ওর বাবা পছন্দ করে না এটা ও জানে। আর জানে বলেই সেই অপছন্দের ওপর আঘাত করতে চায়। ওর বাবা চায় সব বাঁধন থেকে আলগা হয়ে গিয়ে শান্তি পেতে। অপর্ণা চায় পরিপূর্ণ অশান্তি।

ওরা চলে যাবার পর সৌমেন্দু আবার এসে বসে নিজের টেবিলটার পাশে। অনেকদিন কিছু লেখা হচ্ছে না। আগে লেখার জন্যে একটা তাগিত আসত ভেতর থেকে। এখন শুধু চুপচাপ বসে ভাবতে ইচ্ছা করে। কোথাও কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে কাটিয়ে আসতে পারলে ভালো হত। কিন্তু পারে না। পারে না শুধু মেয়েটার জন্যে। অপর্ণা এখন আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই যে রবারের একটা পুতুল কোলে নিয়ে চুপচাপ দরজার কাছে বসে থাকবে বাবার জন্যে। তবুও পারে না। মনে হয় অপর্ণা যেন এখনও সেই ছোট্ট মেয়েটি।

অপর্ণার কথা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে আরেকটা মুখ। অনেকটা অপর্ণার মতোই দেখ্তে। ইউনিভার্সিটিতেই পরিচয়। প্রথম পরিচয়ে কোন নাটকীয়তা ছিলনা। এমনি যেমন আলাপ হয়

তেমনি। সেই পরিচয়টা দানা বাঁধলো স্পেশাল পেপার ঠিক করার সময়। সৌমেনের পছন্দটাই বেছে নিয়েছিল তামসী। তারপর এলো জল্পনা-কল্পনা-ঠাট্টা। সৌমেন ভালোবাসলো তামসীকে। তামসী অনেক কাছে চলে এসেছে সৌমেনের। তবুও কেন জানি সৌমেন ভাবতো তামসীকে সে পাবে না। তামসী বড়লোকের মেয়ে। সৌমেন নিজের সম্বন্ধে সচেতন। তার বাবা সাধারণ সরকারি চাকুরে। তাদের সে ছোট্ট শান্ত সংসারে হাজার পাওয়ারের আলো যেন বেমানান। তবুও সৌমেন পারেনি নিজেকে ঠিক রাখতে সেদিন, যেদিন তামসী এসে সৌমেনকে জানায় তার বিয়ের কথা।

টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারটা খোলে। একটা পুরণো ডায়রি থেকে একটা নীল খাম বের করে। একটু নাড়া চাড়া করে। তারপর ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করে। ছোট্ট চিঠি। তামসীর শেষ চিঠি। প্রায় কুড়ি বছর আগের লেখা। আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছে।

সৌমেন,

তোমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলাম না বলে কিছু মনে করোনা। নিজেকে ঠকাতে পারিনা তাই যাচ্ছি। সঙ্গের ফর্মটা ফিল-আপ করে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। অপর্ণা তোমার মেয়ে। তাকে দেখো।

ইতি

তামসী

সামনে টাঙানো মায়ের ফটোটার দিকে তাকালে ভেতরটাতে কেমন যেন একটা মোচড় খায়। মা-বাবা দুজনের ইচ্ছাকে এড়িয়ে গিয়েছিল ও। 'ল' পড়ার বদলে ছেলে যখন এম, এ পড়তে যায় তখনও মায়ের মনে একটু আশা ছিল ছেলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে।

কিন্তু এম, এ, পড়তে পড়তেই ছেলে যখন সহপাঠিনী তামসীকে নিয়ে এলো বধূ হিসেবে, সেদিন প্রথম ছেলের দিক থেকে মুখ ফেরায় ওর মা। সৌমেন বুঝলো মা-বাবার কারও সম্মতি নেই এ বিয়েতে। সম্মতি যে নেই বা তামসীকে তারা গ্রহণ করেননি এমন কোন ঘটনা থেকে সৌমেন তা বোঝেনি। বুঝেছে তার অনুভূতি দিয়ে। তামসী আসার দরুণ যে ছন্দ পতন, যেটাকে সে অসম্মতি ভাবছে, তামসী তা মোটেই চিন্তা করেনি। তারপর চললো কয়েক বছর ধরে লুকোচুরি, মা-বাবা আর ছেলেতে। সংসারে কোথায় কি ঘটলো, কোনটার অভাব হলো, তামসী কখনও ভাবেনি। দেখে মনে হতো সংসারটার প্রতি একটা বিরাট অবজ্ঞাই যেন ছিল ওর।

এ বাড়ীতে আসার পর থেকে তামসী সৌমেন্দুকে পুরোপুরি কাছে পায় না। কোথাও বেড়াতে যাবার কথা বললে, সৌমেনের মা-বাবার অনুমতি নিতে হবে জেনে আর এগোয়নি সে বিষয়ে। নিজের খেয়াল খুশী মতো চলা ফেরা করতে অভ্যস্থ তামসী। তাই এখানে এসে যখন কূলবধূর বেড়াজালে জড়িয়ে পড়লো, তখনই মনটা কেমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সৌমেন ভালোবাসে তাই বিয়ে করেছে! তাই বলে নিজের স্বাধীনতা নষ্ট হবে এমন চিন্তা সে স্বপ্নেও করেনি।

নিজের খেয়াল খুশী মতো চলাফেরা করতে আরম্ভ করলো তামসী। কেউ কিছু মনে করলো কিনা বা এতে কারও কোন আপত্তি থাকতে পারে—এসবে ভ্রূক্ষেপ করতো না ও। এক সৌমেন ছাড়া আর কেউ কোন মন্তব্য করেনি ওর চলাফেরায়। সৌমেন কিন্তু বুঝে উঠতে পারতো না ও কি করবে। তামসীকে ও বোঝাতে চেষ্টা করে।

—ত্যাখো, আগের 'তুমি' এখনকার 'তুমি'তে অনেক তফাৎ। এখন তুমি একটা বাড়ীর বৌ এটা বুঝতে চাওনা কেন?

তামসী নির্দ্বিধায় জবাব দিত।

—তোমার ইচ্ছে হয়তুমি আরও ভালো করে বোঝ। আমার বুঝে কাজ নেই। ‹তুমি কি বলতে চাও তোমায় বিয়ে করেছি বলে আমার সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তোমার মা-বাবার সেবা করবো, ঘরের কাজকর্ম করবো? একটা ঝি বিয়ে করলেই তো পারতে, সমস্যার মীমাংশা হয়ে যেতো।›

এরকম আরো ক্লুত টুকরো টুকরো সুন্দর কথা তামসী সৌমেনকে বলেছে। আজও সে সব কথা মনে এলে কেমন এক অবসাদ অনুভব করে।

এমনি করেই সময়ের তাল রাখতে গিয়ে নিজের তাল হারিয়ে ফেলে সৌমেন। তামসী ওর খেয়াল খুশীমতো বাড়ী আসে, আবার নিজের খুশীমতো বেরিয়েও যায়। এমনি করে যখন বছর দুই কাটলো, ওদের পরিবারে এলো এক নতুন অতিথি মেয়ে। সৌমেন দেখেছে তামসীকে কেমন অসহায় আক্রোশে ফেটে পড়তে। শরীরের এই বেঢপ রূপ যেন ও কল্পনাই করতে পারেনি কখনো। সেই সময় তামসী কিছুদিন ঘরে ছিল নিরুপায় ভাবে। মেয়ে অপর্ণা জন্মাবার কয়েক মাস পরেই মা-বাবা পালা করেই যেন মারা যান। সৌমেন ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ে। সংসারের সব বোঝাই ওকে টানতে হয়। অপর্ণাও বাদ যায় না। তামসী কেমন যেন ওর মেয়েটাকেই সইতে পারে না। ও কেন এমন হল এ চিন্তা সব সময় সৌমেনের মনের আনাচে কানাচে ঘোরে তবুও তার সমাধান পায় না। নিজের সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক মায়া মমতাও কি নেই তামসীর, তাহলে সৌমেনকে ভালোবাসলো কি করে? অসহ্য যন্ত্রণায় যখন সৌমেনের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হত সেরকম কোন সময়ে তামসীকে জিজ্ঞেস করেছে—তুমি দিন দিন এরকম হয়ে পড়ছো কেন? সংসারের কোন কিছুই কি তুমি দেখবে না? অন্তত অপুকে তোমার দেখা উচিৎ।

—মেয়েটা তোমারও। তাছাড়া ‹তোমায় বিয়ে করেছি বলে

তোমার কথা অনুযায়ী চলতে হবে এমন কোন এগ্রিমেন্ট তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই করিনি। আমার চলফেরা তোমার পছন্দ না হয়— জানিও। তোমার মধ্যযুগীয় চলাফেরা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

এরকম আরও কত কথা জমা পড়ে আছে সৌমেনের মনের খাতায় তার হিসেব নেই। ভালোবেসে তামসীকে বিয়ে করেছিল। সুন্দর সুস্থ একটি সংসারের ছবি দেখেছিল। কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেল। সব ছেড়েছুড়ে সৌমেন বেরিয়ে যেত কোথাও, পারেনা শুধু মেয়েটার জন্যে। সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এটা সে কখনো ভাবেনি।

মা হওয়ার ইচ্ছা তামসীর কখনো ছিল না। কি জানি হয়তো তাই মা হওয়ার পর সংসারের প্রতি তামসীর বিরূপতা বেড়েই গিয়েছিল। সৌমেনের আজও মনে পড়ে কতদিন কলেজ কামাই করেছে ছোট্ট অপর্ণাকে পাহারা দেবার জন্যে।

অপর্ণা বড় হতে থাকে। যৌবন হারাবার ভয়ে তামসী বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। সৌমেনকে তার ভীষন ভয়। আরেকবার সুযোগ পেলে হয়তো লোকটা স্বামীত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে দ্বিতীয়বার মা হতে বাধ্য করবে। তা সে কখনো হতে দিতে পারেনা। বন্ধু বান্ধবীরা সবাই তার রূপের প্রসংশা করে। 'একটা লোকের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে তার যৌবনকে সে নষ্ট হতে দিতে পারে না।' সৌমেন সব বোঝে, তাই নীরবে গুটিয়ে নেয় নিজেকে। ভুলতে চেষ্টা করে এই মেয়েকেই সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। ভুলেও মনে স্থান দেয় না ছাত্র জীবনে তামসী-সৌমেনের ছোট ছোট মধুর ঘটনা গুলোর কথা। তামসীর উপেক্ষাকে তাই সয়ে নিয়েছিল সৌমেন। কিন্তু আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনলো তামসী তার টাকার চাহিদা মেটানো সাধারণ এক কলেজ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। তার নিত্য নৈমিত্তিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে সৌমেন হাঁফিয়ে ওঠে।

আজও মনে পড়ে সেদিনটার কথা। নিজেকে কিছুটা বশে আনবার জন্যে, বিক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থার প্রশান্তি আনবার জন্যে বেড়াতে গিয়েছিল বাংলার বাইরে। আপরিচিত জায়গার কল্যাণেই হোক বা সংসার-চিন্তাটা কয়েকদিনের জন্যে মুলতুবি রাখার জন্যেই হোক, মনের গ্যাঁজলা ওঠা ভাবটা কেটে গিয়েছিল। বেশ প্রফুল্ল মনেই বাড়ী ফেরে। মনে মনে তৈরী হয়ে নেয় তামসীর সঙ্গে একটা আপস করে নেবে, যাতে সংসারে কোন অশান্তি না থাকে। তাতে নিজেরা অসুখী হলেও মেয়েটার উপকার হবে। সব চাইতে বড় কথা যারা ভালোবেসে বিয়ে করাটা আদৌ পছন্দ করেনা তাদের মুখ বন্ধ করা। বাড়ীতে ঢুকেই দেখে বারান্দায় অপর্ণা একটা পুতুল কোলে নিয়ে সুর করে ঘুম পাড়াচ্ছে। মেয়েটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে ঝিটাকে জিজ্ঞেস করে তামসীর কথা। জবাবটা প্রথম বোধগম্য হতে চায়নি। পরে বুঝলো, চার পাঁচদিন ধরে তামসী বাড়ী আসেনি। কেমন এক অবসাদে সৌমেন বসে পড়ে। কি করবে বা করা উচিত ভেবে পায়না। মেয়েটাকে আরও শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে। ভেবে পায়না তামসী ফেরেনি কেন। কোঁন এ্যাকসিডেণ্ট! যা রাগী, বলা যায়না কিছু করে বসতেও পারে। মেয়েটাকে কোলে নিয়ে অন্য হাতে স্যুটকেশ শুদ্ধ, ঘরে ঢোকে। চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকে কিছুক্ষণ। একটা সিগারেট ধরায়। ঝিটা চা দিয়ে যাবার সময় বলে অপর্ণাকে নিয়ে যেতে। চা খেতে খেতেই ভাবে এখন কোথয়া যাবে, কার কাছে যাবে। বন্ধু বান্ধব বলতে বিশেষ কেউ নেই। যারা ছিল বিয়ের পর থেকে তাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখেনি। চা খেতে খেতেই টেবিলের ওপর রাখা একটা বই থেকে একটা খাম কিছুটা বেরিয়ে রয়েছে দেখে অন্যমনস্ক ভাবে টেনে বের করে খামটা। নিজের নাম দেখে চমকে ওঠে। পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ওর নাম। কি এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে হাতটা। আরও কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর বের করে চিঠিটা।

কয়েকটা মাত্র লাইন। কয়েক বছরের ইতিহাস, কয়েক বছরের নিবিড় সম্পর্ক, কয়েকটা কথায় ইতি।

কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে অপর্ণাকে কোলে নিয়ে ইচ্ছে করে ভেঙে চুরমার করে দেয় তামসীর সংসার, যে সংসারে ছোট্ট একটা মেয়ের স্থান হলো না। মেয়েটাও তেমনি। সবকিছু যেন বুঝে বসে আছে। বিকেল হলেই রবারের পুতুলটা নিয়ে বারান্দায় বসে থাকে বাবা আসার অপেক্ষায়। এতটুকু বিরক্ত করেনা সৌমেনকে। আজ অপর্ণা বড় হয়েছে। কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়েছে।

অনেকদিন পর, প্রায় চার বছর পর প্রবীর নিজের আস্তানায় ফিরছে—কলকাতায়। আসানসোলের পর থেকে মনে হচ্ছে এ যেন পরিচিত জায়গা। একান্তভাবে যেন নিজের রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক। উত্তরপাড়া ষ্টেশন ছাড়ার পরই ওর ছোট চামড়ার স্যুটকেশটা নিয়ে গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়ায়। ভাবখানা এই, যেন পরের ষ্টেশনেই নামবে। একেকটা ষ্টেশন পেরয় আর ও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে হাওড়া ষ্টেশনের জন্যে। হাওড়ার আগেই গাড়ীটা দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রবীর ছটফট করতে থাকে। ইচ্ছে হয় ওখানেই নেমে চলে আসে। কতটুকু আর রাস্তা। গাড়ীটা নড়ে উঠে। তারপর ধীরে ধীরে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। গাড়ী থেকে নেমে মনে হচ্ছে যতটুকু পরিচিত হবার কথা ছিল ষ্টেশনটা ততটুকু পরিচিত মনে হচ্ছে না। সময়ের সুযোগে অনেকখানি চেহারাই যেন পালটে গেছে। কতবার এসেছে এই বিরাট ষ্টেশনে। কাউকে বিদায় জানাতে, বা কাউকে আহ্বান জানাতে। তাছাড়া এমনিতেও এসেছে অনেকবার, কারণে অকারণে। আজ যেন মনে হচ্ছে অনেক কিছুই পালটেছে এর। চারপাশ তাকাতে তাকাতে ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ায়। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। না বলে কয়েই পাড়ি জমিয়েছিল অনির্দিষ্ট পথে। এখান থেকে সেখানে ঘোরাঘুরির পর হাজির হয়েছিল মামার কাছে—দিল্লীতে। মামা বড় অফিসার তাই চাকরিও জুটে গেল শেষ পর্য্যন্ত।

ট্যাক্সির জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, যে কলকাতার জন্যে তার এত আগ্রহ সেই কলকাতাকে একটা বিরাট সরিসৃপ মনে করে পালিয়ে গিয়েছিল। পালিয়েই গিয়েছিল। নইলে বন্ধুবান্ধব, যারা না থাকলে জীবনের অনেকখানিই খালি, তাদের সঙ্গে কোন

সম্পর্ক রাখেনি, কোন চিঠি দেয়নি কাউকে। ভেবেছিল কলকাতার সেই পুরনো দিনগুলো চাপা পড়ে গেছে দিল্লীর কাজের চাপে। আজ সব একের পর এক এসে ভীড় জমিয়েছে মনের দরজায়। ঠেলাঠেলি করে সবাই চাইছে আগে বেরিয়ে আসতে।

ছোট বোনটাকে নিয়ে দিদির কাছে থেকেই পড়াশুনা করতো ওরা। বাবার কিছু জমানো টাকা দিয়েই সংসার চলতো ওদের ভাই বোনের। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর কলেজে ভর্ত্তি হয়ে ওর মনে হয়েছিল একলাফে ওর যেন কয়েক বছব বয়স বেড়ে গেছে। ভালোভাবেই বেড়া ডিঙিয়েছিল। তাই দিদির আগ্রহে ভর্ত্তি হয়েছিল প্রেসিডেন্সিতে। প্রথমে অবশ্য হকচকিয়ে গিয়েছিল নতুন ধরণের পরিবেশে। কি সুন্দর সে সব দিনগুলো। যেন এক ঝাঁক মৌসুমী ফুল। অনেকদিন পর দিদির কাছে যাচ্ছে। মায়ের ছবিটা দিদিই ঢেকে দিয়েছিল ওব স্নেহে যত্নে, তাই মাকে মনে করতে গেলেই মনে পড়ে দিদির মুখটা।

ট্যাক্সির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে পাশের দোকান, লোকজন সবকিছুব বিচিত্র ছবি। অকারণ অসময়েই মনে পড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো অতীতের কথাগুলো। ভাবে, দিদি এখন কি করছে? অমিতকে সামলাতে সামলাতেই হয়তো অস্থিব। মাষ্টার মশাই? চুপচাপ টেবিলের সামনে বসে ভাবছেন, নয়তো লিখছেন, আর অপর্ণা? পরিতোষ অর্ণব, সুরঞ্জন, সোনালী কবিতা—এরা কি করছে? পথের লোকজন এবং খাপছাড়া ভাবনাগুলো ওকে পৌঁছে দেয় ওর নির্দিষ্ট জায়গায়। ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ে। কেমন যেন একটা আনন্দ মেশানো ভয়। ভয়টা কিসের বুঝতে পারে না। গলির মোড়টাতে পরিচিত পানের দোকানদার কুশল জিজ্ঞাসা করে। অলক্ষুনে ভবতোষবাবু তার বাড়ীর দরজার সামনেই দাঁড়ানো। পাড়ার ছেলেরা যাকে দুচোখ খেলেও দেখতে পারে না।

হয়তো প্রবীর এখানে থাকে না বলেই হেসে ওকে কুশল প্রশ্ন করে এবং সময় পেলে ওর বাড়ী যাবার আমন্ত্রণ জানায়। আগে যাদের ছোট দেখেছিল অর্থাৎ পাড়ার জুনিয়র গ্রুপ, তারা এখন রকে আসর জমিয়েছে। যেমন প্রবীররা আগে জমাতো। তাদের দিকে একটুখানি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে সটান ঘবে ঢুকে পড়ে।

হাড় মাস বের করা মধ্য কলকাতার সে বাড়ীটায় জামাইবাবু অনেক দিনের বাসিন্দা। ভেতরে একফালি উঠোন আছে। নীচে পাঁচখানা ঘব দোতলায় চারখানা। নতুন কেউ এলে এই ছোট্ট উঠোনেই একবার ডিগবাজী খেতো, নয়তো ওপরে যাবার সময় সিঁড়িতেই। নীচেই কল, তাই ওপরের সবাইকে জল টানতে হয় নীচের থেকে। সেই জলের কিছু পরিমান সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে। প্রবীরের হাসি পেয়ে যায়—একদিনের কথা মনে পড়ে। কার সঙ্গে কথা বলতে জামাইবাবু ওপরে গিয়েছিলেন। একটু মোটা সোটা ভদ্রলোক, নামবার সময় সিঁড়িতে তাল সামলাতে না পেরে ধপাস করে বসেই চড় চড় করে শেষ ধাপ অবধি নেমে এসেছিলেন বিনা আয়াশে। সেই দেখে ও আর দিদির সেই কি হাসি। হাসতে হাসতে দুজনেরই দম ব হবার উপক্রম। জামাইবাবু তখন অনেক কষ্টে কোন রকমে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়েছেন। সেই বাড়ী। নীচতলার দুখানা ঘর দিদির। রাস্তার দিকের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা। ভেতরের ঘরটা ছিল প্রবীরের। তারই বাবান্দায় দিদির রান্নার জায়গা। দিদি উনুনে আগুন দিচ্ছে। পেছন থেকে প্রবীর বলে ওঠে, আরেকজনের চাল নিও। মুখ ফিরিয়ে প্রবীরকে দেখেই দিদি চোখের জল সামলাতে পারে না। ধরা গলাতে বলে,

—আমি ভেবেছিলাম তুই আর কখনো আসবিনা। অমিত! দেখে যা কে এসেছে। রেণুকে আনিসনি?

—না মামার সঙ্গে ও কাশ্মীর যাবে।

—তুই এলি কেন? তুইও তো যেতে পারতিস। যা, জামা-

কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে আয়, আমি চায়েব জল বসাচ্ছি। হ্যাঁরে, থাকবি ত কয়েক দিন ?

—এক মাসের ছুটি নিয়েছি। চাওত একেবারেই থেকে যেতে পারি। বিশ্রী লাগে ওখানে। খাও, ঘুমোও, চাকরি করো। ব্যাস, জীবনে যেন আর কিছুই নেই।

—তুমি কে ? প্রবীরের পাঞ্জাবীর কোণটা টেনে ধরে অমিত বলে। পেছন থেকে সামনে টেনে এনে ওকে কোলে তুলে নেয় প্রবীর।

—বলোত আমি কে ?

—তুমি পাঞ্জাবী।

—সেকি রে !

—বাবা বলেছে, পাঞ্জাবী পরে পাঞ্জাবীরা।

—তোর বাবার যেমন বুদ্ধি।

—ওটা তোর মামা। এমন ডেঁপো হয়ে উঠছে দিন দিন,—কি বলবো।

চা খেতে খেতে গল্প চলে প্রবীব আর দিদিতে। প্রয়োজনীয় সব কথা। তিন চার বছর ধরে জমে থাকা সব কথাই যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসবে দিদির মুখ থেকে। এমনি কথা বলতে বলতে এক সময় দিদি বলে।

—জানিস, তুই চলে যাবার মাসখানেক পর অপু এসেছিল। অনেক্ষন বসেছিল। চা খেলো, অমিতকে নিয়ে গল্প কবলো অনেক্ষণ। বুঝলাম তোর খোঁজ করতেই এসেছে। কিন্তু তোর কথা একবারও জিজ্ঞেস করলো না। শুধু বলেছিল, রেণুকে এভাবে হুট করে নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। বেচারীর হয়তো পড়াশুনার ক্ষতি হবে। তুই কি ওর সঙ্গে রাগারাগি করে গিয়েছিলি ?

—না।

—তবে ওরকম ভাবে পরীক্ষা না দিয়েই চলে গেলি কেন ?

BIRCH LIBRARY
AGARTALA

—পড়াশুনো করতে ভালো লাগেনি তাই।

—কি জানি, তোদের মতিগতি বোঝা আমাদের সাধ্যের বাইরে। কোথায় যাচ্ছিস ?

—এই একটু ঘুরে আসি। কতদিন কলকাতার মুখ দেখিনা।

—হ্যাঁরে প্রবীর, তুই না বলতিস, কলকাতা তোকে লাথি মেরে তাড়ালেও তুই যাবি না।

—তখনকার 'আমি' আর আজকের 'আমি' কি এক ?

—হুঁ, তুই বড় হয়েছিস্। তাড়াতাড়ি ফিরিস।

রাস্তায় বেরিয়ে ভাবে—কোথায় যাবে, কার সঙ্গে দেখা করবে। কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে আপন মনে পথ চলতে থাকে। অনেক দিনের পরিচিত এই কলকাতা। পথ, ঘাট, মানুষ সবই তার আত্মীয়। তবু আজ যেন এসব সে অনেক দূর থেকে দেখছে, কাছের ভাবতে পারছেনা। কোথায় যেন এক বিরাট প্রাচীর। সে জানে প্রাচীরটা কি। মনে পড়ে বিগত দিনগুলোর ছবি। হাসি কান্নায় ভরা তখনকার দিনগুলো এতদিন মনে পড়েনি বা মনে পড়েনা একথা মুখে স্বীকার করলেও—সত্য নয়। সেসব দিনগুলোর প্রত্যেকটাতে কার যেন অকারণ ছায়া। বহু চেষ্টা করেও যে ছায়া মুছে ফেলতে পারেনি ও। যার জন্যে কোন কিছু মনে করতে গেলেই পরমুহূর্তে সেই ছায়ার আবির্ভাবে সব কেমন বেসামাল হয়ে যায়। একটি মাত্র নাম—অপর্ণা। সমস্ত শক্তি দিয়েও যদি মুছে ফেলতে পারতো সেই নামটা!

—অনেকদিন পরে দেখছি আপনাকে চিনতে পারছেন ? খেয়ালই করেনি প্রবীর কখন পথ চলতে চলতে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আর তার পাশে এক মহিলা দাঁড়িয়ে।

—আপনি ? আমি তো—।

—যাক্, চিনতে পেরেছেন তাহলে। মোড় পেরতে গিয়ে আপনাকে দেখে একটু চমকে গিয়েছিলাম। ঠিক বুঝতে পারছিলাম

না—আপনি কিনা। তাই কাছে এসে দাঁড়ালাম। মনে হলো, আপনি যেন না দেখারই চেষ্টা করছেন। অনেক বদলে গেছেন দেখছি।

—তার মানে?

—কেন? আগে তুমি বলতেন আর এখন আপনি! কোথায় থাকেন?

—দিল্লী। চাকরি পেয়ে চলে গেলাম।

—আপনার কোন বন্ধুদের সঙ্গেও ত যোগাযোগ রাখেন না শুনেছি।

—তাই না কি?

—তা নয় ত কি। হয়তো আমাদের ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমরা ভুলিনি। যুব উৎসবে আপনার গল্পটা প্রথম হলো। প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের সময় আপনার পাত্তা নেই। নেই ত নেই। তারপর এই আজকে দেখলাম।

—আমার গল্প যুব উৎসবে প্রথম হয়েছে? তা কি করে হয়। আমি কোন গল্পই দিই নি।

—বাঃ! বেশ! অপূর্ব! কলেজে আপনার নামে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। থাকলে—

—বিশ্বাস করো শীলা, আমি কিছুই জানিনা।

—বেশ, বিশ্বাস করলাম। চলুন বাড়ী যাই। অনেকদিন পর দেখা, ঠিক ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না।

—আরেক দিন যাবো। আজ বরং কোথাও চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে। রাজি?

—চলুন।

পথ চলতে চলতেই প্রবীর জিজ্ঞেস করে।

—কোথা থেকে বাড়ী ফিরছিলে?

—টিউশন।

—সুরঞ্জনের খবর কি ?

—জানি না।

—সে কি! তুমি সুরঞ্জনের খবর জানো না এ কি করে হয়।

—সবই হয় প্রবীবদা। এখানে থাকলে দেখতেন অনেক কিছুই হয় যা আগে থাকতে ভাবা যায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে প্রবীরেব। শীলা বলে চলে,

—আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, তবে আমাদের ক্লাসের ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়া ছিল। সেদিন কল্পনাও করিনি যে আমাদের সে ইউনিট ভেঙে যাবে। আপনি ত চলে গেলেন। তারপব ফাইনাল পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমরা বাকারা ছিলাম। কিন্তু প্রথম একবছর দুবছরের সময় আমাদের ভেতর যে সুন্দর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল, যাতে কখনও ফাটল ধরবে আশা করিনি—তাই ভেঙে চুবমার হয়ে গেল। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল সবাই। বেশী দূরে যাব না—এ দোকানটাতেই চলুন।

চা খেতে খেতে প্রবীব জানতে চায় সুরঞ্জনের খবর, সোনালী, পরিতোষ, সমীরণ, শিবব্রত, অঙ্গনা সবার খবর। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে শীলা। ছোট্ট একটা নি শ্বাস ছেড়ে বলে,

—সুরঞ্জন এখন লেখক হয়েছে। উদীয়মান নয়, উদিত। ফাইনাল ইয়ারেই একটা মাসিক কাগজ বের করে। উৎসাহ আমারও ছিল। তারপর ও সিনেমার পথ ধরলো। এখনও অবশ্য কিছু করে উঠতে পারেনি। তবে চেষ্টায় আে জানেন, চিত্র পরিচালনায় ওর ডিপ্লোমা আছে? ভালোকথা সমীরণের একটা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে জানেন?

জানি। কলকাতার ঠিকানায় বইটা পাঠিয়েছিল। রিডাইরেক্ট হয়ে আমার কাছে যায়।

—অথচ দেখুন আপনার দিদি আমাদের ঠিকানা দেন নি।

—বারণ করেছিলাম। যাকগে, যা বলছিলে বলো।

—আপনারা সবাই মিলে অপর্ণার মধ্যে কি দেখেছিলেন কে জানে। কলেজের প্রত্যেকটা ছেলে যেন সব কিছু ওকে দিয়ে দিতে পারলেই ধন্য হোত। কে না!

—ওর কথা থাক।

—ওকে ছাড়া ত আমাদের কোন কথা নেই। প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে অপর্ণা-সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছে।

প্রবীর ধাক্কাটা সামলে নেয়। শীলাকে বুঝতে দেয় না এখনও অপর্ণার কথা শুনলে ওর ভেতরে এক অব্যক্ত যন্ত্রনা সুরু হয়।

—সুরঞ্জন ?

—হ্যাঁ। কিছুদিন ও সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিল। কলেজে এলেও ঠিকমতো ক্লাস করতো না। সবার সামনেই অপর্ণাকে নিয়ে বেরিয়ে যেত।

—তুমি ?

—আমার কথা বাদ দিন। বাবা মা ত ধরেই নিয়েছিলেন আমার একটা হিল্লে হল। আমি ওঁদের আজও সবকিছু খোলাখুলি বলিনি। আজ কি জানি কেন আপনাকে দেখে—।

—কিন্তু সুরঞ্জনকে তোমার ব্যাপারেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাতে সে বলেছিল তুমি ওর জীবনে ম্যাগনিফিসিয়েণ্ট ওয়ান।

—খোঁজ নিলেই হয়তো জানতে পারবেন আপনার বন্ধু ওরকম কথা আরও অনেককে বলেছে। অপর্ণার মুখ তো জানেন। সেজন্যে ওকে আর কোন কথা বলিনি। অনেক চেষ্টা করে একদিন 'সু'-এর সঙ্গে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছিলাম।

—অনেক চেষ্টা করে ?

—হ্যাঁ। কোথাও যাবার কথা বললে, থিয়েটার ইউনিট,

অথবা চিত্রনাট্য পড়ে শোনাবার তারিখ, স্যুটিং ইত্যাদি ধরণের কথা বলে কাটাতো।

—বেশ তো, তারপর?

—অনেক চেষ্টা করে অপর্ণার কথা তুলেছিলাম। চূড়ান্ত ঠাট্টা করেছিল ও সেদিন। আমি নাকি পঞ্চদশ শতাব্দীর মেয়ে। এছাড়া আরও অনেক কিছু বলেছিল যা আপনাকে বলতে পারবো না। শুধু খোলাখুলি একটা কথা বলেছিল। বলেছিল, আমি অপর্ণাকে ভালোবাসিনা, সেও আমাকে ভালোবাসেনা। ও চায় আমার কাছ থেকে ক্ষণিক আনন্দ। আমি চেষ্টা করি ওটা পুষিয়ে দিতে। এরপর আর কথা চলেনা। কোন অভিযোগ করিনি, চুপচাপ সরে গেছি ওর কাছ থেকে। প্রবীরদা, আপনিই বলুন—।

—থাক্। আজ উঠি। পরে তোমাদের বাড়ী যাবো, কেমন?

শীলাদের বাড়ীর দরজা পর্যন্ত প্রবীর পৌঁছে দেয় ওকে। সারা রাস্তায় আর কোন কথা হয় না। দীর্ঘদিন ধরে যাকে ভুল্‌তে চাইছে তাকে ভুলতে পারছে না। কুৎসিৎ ভাবে কেউ না কেউ সেটা মনে করিয়ে দেয়। ভেবে পায় না অপুর এরকম অধঃপতনের কারণ কি। যে কজনের সঙ্গে কলেজে ঘনিষ্টতা ছিল প্রবীরের, তার মধ্যে সুরঞ্জন অন্যতম। কোথায় যেন তুজনের একটা মিল ছিল। আজ কেন যেন মনে হচ্ছে মিলটা দৃষ্টিবিভ্রম। কি জানি হয়তো বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবীরের ধারণাই ভুল, সুরঞ্জনরা ঠিক। নইলে এই সুরঞ্জনই একদিন কথাচ্ছলে প্রবীরকে বলেছিল "মন যা বলে তাই করতে হবে, এটা ঠিক নয়। মনকে সংযত করতে না পারাটা অপৌরুষেয়।" কথা হয়েছিল একজন একই সঙ্গে তুটো মেয়েকে ভালোবাসতে পারে কিনা। ও বলেছিল ভালোবাসতে হয়তো পারে, তবে প্রথমে যাকে ভালোবেসে ছিল তার প্রতি অবিচার করা হয়। সুতরাং

তা উচিৎ নয়। মন যদি ঔচিত্য মেনে চলতে না চায় তবে বুঝতে হবে সে দুর্বলচিত্ত লোক। আজ সুরঞ্জন স্বীকার করবে কি সে কথা? বলবে কি, শরীরের তৃপ্তিব সঙ্গে মনেরও তৃপ্তি হয় এবং সেটা শালার প্রতি অবিচার? একথা আজ সুরঞ্জনকে বলেও হয়তো কোন লাভ হবে না। জীবন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বিচিত্রতর। কেউ প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ এগুলোর বিশেষ মর্যাদা দেয়, আর কেউ বা ফ্রয়েডীয় মনোভাব নিয়ে এসব ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। বলবে, সব কিছুর আবির্ভাব সেক্স থেকে।

প্রবীর কি একথা ভাবেনি? ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষনকে সেও ত অস্বীকার করতে পারে না। তবুও কোথায় যেন বাধা। মেনে নিতে পারে না দেহ-সর্বস্ব চিন্তাধারাকে। নইলে দিল্লী গিয়ে সেরকম অনেক সুযোগই ত সে পেয়েছিল। কই গ্রহণ কবতে পেরেছে? কেন সে সেসব মেয়েদের ভেতর শুধু অপর্ণার ছায়া দেখতে চেয়েছ? যাদের ভেতর অপর্ণার ছাযার কিছুটাও দেখেছে, কি এক দুস্তর ঘৃণা এবং অভিমান দূরে সরিয়ে দিয়েছে ওকে। আজ প্রায় তিন বছরেরও পর প্রবীব এসেছে কলকাতায়। আসাব সময় মনকে শক্ত করেই এসেছিল। ভেবেছিল, কলকাতা অপর্ণার একচেটে নয়। কিন্ত এ পর্যন্ত সে কি একবারও ভেবেছে অপর্ণাহীন কলকাতাকে?

পথে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকেব সঙ্গে ধাক্কায় অন্যমনস্ক প্রবীর সম্বীত ফিরে পায়। বোঝে দিদির বাসার পথ সে অনেক্ষণ পেরিয়ে গেছে। শালা বলেছে ওর গল্প প্রথম হয়েছে। বুঝে উঠতে পারছেনা কে ওর নামে গল্প জমা দিল। তাছাড়া সুরঞ্জনের পত্রিকায়? যেটা সে বুঝতে পারছে সেটা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। কলেজে থাকতেই কাঁচা হাতের লেখা একটা গল্পের খাতা অপর্ণাকে দিয়েছিল কপি করে দিতে। তাছাড়া

ওর বাবাকেও যেন পড়ায় গল্পগুলো, অবশ্য প্রবীরের নাম না বলে। মাষ্টার মশাই একটু আধটু শুধরে দেন, অবশ্য শোধরাবার মত যদি হয়। ভরসা ছিল ভেবে তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দও পেয়েছিল কেননা মাষ্টার মশাই তখন মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত লেখক। এছাড়া আর ত কোন গল্প কারও কাছে নেই। এক অপর্ণা আর সুরঞ্জন ছাড়া আব কেউ জানেনা প্রবীরের এই ছেলেমানুষীর খবব। ছেলেমানুষীই ত! তখন চোখে ছিল সুর্‌মা, মনে ছিল আকাশের রঙ। আজ প্র ীর ভাবতেও পারেনা গল্প লেখার কথা। আজ আব লেখক হবার দুঃস্বপ্ন তার রাতের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

ঘবে ঢুকতেই দিদি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—এ্যাদ্দিন পর এলি আর অমনি ঘর ছেড়ে প.লালি। কোথায় দুটো কথা বলবো তার ফুরসৎ পেলাম না। কাল যদি কোথাও বেরিয়েছিস ত তোর পা ভেঙে দেবো।

অমিত ঘুমোচ্ছে। খাটেব পাশে একটা চেয়ারে বসে জামাইবাবু অফিসের ফাইল দেখছেন। দিদি অমিতেরই কোন জামার বোতাম সেলাই করতে করতে প্রবীরকে কথাগুলো বলে। দিদির কথার জবাব না দিয়ে প্রবীর জামাইবাবুকে বলে,

—অফিসেব ফাইলগুলো যদি বাড়ীতেই দেখবেন তবে বাড়ী আসার দরকার কি, অফিসে থাকলেই পাবেন।

তা-যা বলেছ। তবে কি জানো, অফিসে থাকার কোন ব্যবস্থা যে নেই।

—কোথায় কোথায় গিয়েছিলি? অমিত ত 'মামা কই, মামার সঙ্গে যাবো, মামা বেড়াতে নিয়ে যাবে,' বলে বলে শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে আয়। অনেক রাত হয়েছে।

দিদির প্রশ্নের জবাব প্রবীরকে দিতে হয়নি। দিদি হয়তো ধরে নিয়েছে সে অপর্ণার সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিল।

অনেক বেলা করে প্রবীর ঘুম থেকে ওঠে। খুব ভোরে দিদি চা দিয়ে গিয়েছিল, তা খেয়ে আরও ঘণ্টা তু'য়েক ঘুমিয়েছে। তারপর ন'টার সময় অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মজেছে। অবশ্য দাঁত মাজতে ও খুব সময় নেয় না। বাড়ীর অন্যান্য বাসিন্দাদের অফিস স্কুল যাবার তাড়া, তারা কলতলা জাঁকিয়ে আছে। এরা সবাই প্রবীরের পরিচিত। কেননা এ বাড়ীতে সে বড় হয়েছে। বাড়ীর প্রতিটি দাঁত বের করা ইঁটের সঙ্গে ওর পরিচয়। পুরো বাড়ীটাই একটা বিরাট পরিবারের মতো। ছোট-খাটো মতান্তর থাকলেও মনান্তর নেই বললেই চলে। এমনটা কি করে সম্ভব হয়েছে ভাবলেও অবাক হতে হয়। প্রবাদ আছে, কলকাতার নীচতলার ভাড়াটেরা ওপর তলার লোকের নাম জানেনা। অথচ ওপরের শিবদাসবাবু এ বাড়ীর কয়েক গণ্ডা লোকের কোন লগ্নে জন্ম তাও জানেন। হয়তো সবাই অনেক দিন ধরে আছে তাই। এ বাড়ীর অনেক ছেলেমেয়ের এ বাড়ীটাই জন্মভূমি। সুতরাং ছোটবেলা থেকে জেনে আসা বিভিন্ন আত্মীয়তার সম্বোধন গুলোকে কেমন যেন সবাই অভগ্ন হিসাবেই ধরে নিয়েছে। তাই প্রবীর ঘুম থেকে উঠে কলতলায় দাঁত মাজতে এসে অনেকেরই মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। বহু রকম প্রশ্নের একের পর এক জবাব দিয়ে যায়। কেমন যেন দূর বিদেশ থেকে অনেকদিন পর বাড়ী ফেরার আনন্দই পায় প্রবীর। নীচে যারা ছিল তারা ত ছিলই দোতলার রেলিং ধরেও তু'তিন জন দাঁড়িয়ে। দোতলার কাকীমাই বেশ বড় গলায় নিজের আধিপত্যের জোর দেখান।

—প্রমীলার চা না হলে ওপরেই চলে আয় আমি জল বসিয়েছি।

—আমার চা হয়ে গেছে কাকীমা। নীচে থেকে দিদি চেঁচিয়ে বলে। প্রবীর হেসে বলে,

—দিদির চা বার্লি আর কাকীমার চা—

—বল না বল।

—পরে বলবো। এখন বললে ত চা-ই পাবো না।

মুখ ধুয়ে প্রবীর দিদির রান্নার জায়গায় এসে বসে। জামাইবাবু তখন খেতে বসেছেন অফিস যাবার তাড়ায়। অমিতও বসেছে প্রথম দফা খেতে।

—তা মাষ্টার তোমাদের দিল্লীর গল্প বলো শুনি। এখানে ত দিল্লীর লাড্ডু ছাড়া আর কিছু জুটলো না। জামাইবাবু বললেন

—তবুও জুটেছে, আমাদের ত তাও জোটেনা।

—থাম্‌তো। ওঁর সঙ্গে পরে কথা বললেও চলবে। গতবার পূজোর সময় কত করে বললাম, চলো কয়েক দিনেরই ছুটি নিয়ে দিল্লী ঘুরে আসি। তা বাবুর আর অফিসের কাজই শেষ হয়না।

—ওরে অমিত তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, তোর মা ক্ষেপেছে।

—কেন ?

—থাম্‌ পাজী কোথাকার। সব সময় খালি 'কেন' আর 'কেন'।

—তবেরে, তোর 'কেন' বার করছি দাঁড়া। সারাদিন জ্বালিয়ে খায় জানিস্‌। যেটা বারণ করবো সেটার জন্যই বায়না। মুখখানা দেখ্‌ কেমন বোকা বোকা, যেন কিছুই বোঝে না। হাড় বদমাইশ। সব বোঝে।

অমিত ওর বাবার কাছ ঘেঁসে বসেছে। জামাইবাবুর খাওয়া আরও তাড়াতাড়ি চলছে। দিদি ছেলের ওপর রাগ করে এক চামচ ভাত বেশীই দিয়ে দিয়েছে। প্রবীর হাসি থামাতে পারছেনা। এখনও সেই ঝগড়ার ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

তাহলে মাষ্টার, তোমার সঙ্গে ওবেলাই কথা হবে। পারতো তোমার দিদিকে একটা নাইট শো'এর টিকিট কেটে দিও।

—হ্যাঁ, আমি না থাকলেই তুমি খুশী।—ভালো কথা, আজ কোথাও বেরোস্‌ না।

—কেন ?

—তুইও সেই 'কেন'। এ্যাদ্দিন পর এলি, তোর সঙ্গে দুটো কথাও বলবো না ?

—তা ত বুঝলাম। তাবলে একদিনেই সব কথা বলে শেষ করে বিদেয় করবে নাকি ?

—তোরা সব কেমন বেয়াড়া। কেউ কথা শুনিস্না। একরত্তি ছেলেটা সেটাও গ্রাহ্য কবেনা আমাকে।

প্রবীর চা-টা তাড়াতাড়ি শেষ করে কাকীমার কাছে আর এক কাপ চায়ের আশায় ওপরে চলে যায়। দোতলার ছোট্ট বারান্দাটার বাঁ দিকের কোণায় কাকীমার ছোট্ট রান্নাঘর। উনি একটু মোটাসোটা মানুষ। তবুও কাজে অফুরন্ত শক্তি। রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর পর্যন্ত ঝক্ঝকে তকতকে। ঐ ছোট্ট রান্নাঘরের দরজার পাশে প্রবীরকে বসতে দেন ছোট্ট পিঁড়িতে। রান্নাঘরের ভেতরের দিকের কোণে বসে আছে শিখা। উনুনের পাশে ছোট ছোট ডিশ এবং থালায় কয়েক রকমের রান্না। কাকীমা রান্না করতে ভালোবাসেন। প্রবীর শিখার দিকে তাকিয়ে বলে,

—কাকীমা, এ ভদ্রমহিলাকে চিন্তে পারছিনা তো।

—সে কিরে !

—দেখেছিলাম ফ্রক পরা, নাক দিয়ে সিক্নি গড়াত।

—বাজে বোকনাত প্রবীরদা। নাক দিয়ে সিক্নি গড়াতে দেখেছিলে কবে ?

—শুনুন কাকীমা, আমি নাকি—।

—থাক্। সে রকম ঝগড়াটেই র'য় গেলে এখনও। বাইরে থেকে ঘুরে এসেও তোমার কিছু পালটায়নি দেখছি।

—চিনি কম দেবোত রে।

—হ্যাঁ। পড়াশুনো ডকে তুলে দিয়েছিস, না পড়ছিস ?

—পড়ছি তো।

—ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হয়েছে।

—তাহলে সত্যিই ও এখন ভদ্রমহিলা। চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে প্রবীর বলে।

—চচ্চড়ি খাবি ?

—দিন।

চচ্চড়ি খাওয়াব পব চা খেতে খেতে প্রবীর ভাবে, শিখা এখন দেখতে বেশ সুন্দব হয়েছে। আগে কেমন রোগা ছিল। সবই যেন কেমন পালটে গেছে।

—প্রবীবদা, বড়দি বলছিল তোমার নাকি দিল্লীতেই বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছে ?

—তাতে কি ?

—বাঃ! ওখানে বিয়ে করবে, আমরা সবাইকি যেতে পারবো নাকি! ওসব বদ মতলব ছাড়তে হবে। বড়দিকেও সেদিন বলেছি, দিল্লীওয়ালী বিয়ে কবো আর যাই করো, বিয়ে এখানে হবে। বিয়ের পাট ত এবাড়ীতে নেই। তাছাড়া তুমি ত এবাড়ীর বড় ছেলে।

—তোব ভাবতে হবে না। বিয়ে করলে এখানেই করবো। আর বরের পক্ষে কাকে যেন পোঁট্লা পুঁটলি দেয় সেটা তোর জন্যে ব্যবস্থা হবে।

—হ্যাঁ, তা নয়ত কি, রেণু আমার চুল ছিঁড়ুক।

—প্রবীরদা রেণুকে এখানে নিয়ে এলেনা কেন ? ও এখন কি পড়ছে ?

—তোর সঙ্গেই পড়ছে।

এমনি করেই সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়। প্রবীর স্নান খাওয়া করে আরেক দফা ঘুম দিয়ে বিকেলে ওঠে। দিদির তখনও দুপুরের ঘুম ভাঙেনি। মুখ ধুয়ে চুপ চাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। ম্যাটিনি শো'য়ের সময় পেরিয়ে গেছে অনেক্ষণ। চা-ও এখন পাওয়ার

উপায় নেই। জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে কফি হাউসের উদ্দেশ্যে। পরিচিত পথ দিয়ে চলতে গিয়ে আজ কেমন তাল হারিয়ে ফেলছে। রাস্তার দু'পাশের দোকানগুলো অতি পরিচিত। কাউকে দেখেছিল কালো চুলে, আজ হয়তো সেই চুলে পাক ধরেছে। পথ চলতে চলতে ভাবে, যাদের সঙ্গে তিন বছর আগে আড্ডা মেরেছে কফি হাউসে তারা কি আজও সমান তালে আড্ডা দিয়ে যাচ্ছে? কফি হাউসের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভীড়। এরকম সময় ভীড় এখানে লেগেই থাকে। তবে প্রবীরের সময়কার তারাই আসর জমিয়ে রেখেছে না পালাবদল হয়েছে তার? সিঁড়ির গোড়ার দোকান থেকে সিগারেট কেনে প্রবীর। তারপর প্রথম বয়সের উদ্দামতাকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যায়। হলটার দরজাতেই নারী পুরুষ চার পাঁচজন দাঁড়িয়ে। হয়তো বসবার সুযোগ পায়নি তাই। উঁকি মেরে ভেতরটা দেখে। সেখানেও একই অবস্থা। কোথাও ঠাঁই নেই। আজ যেন এ জগতে প্রবীরের অসংকোচ পদক্ষেপ নেই। তাই দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে থাকে। অপর্ণা নেই ত এখানে? থাকাটাই ত স্বাভাবিক। সুরঞ্জনেরও এখানেই ডিউটি। দুপুর থেকে রাত আটটা অবধি। অপর্ণা সুরঞ্জনের কথা মনে হতেই কানটা কেমন গরম হয়ে যায়। ফিরে যাবার কথা ভাবে, অথচ কফি হাউসের দুর্দমনীয় আকর্ষণটাকেই উপেক্ষা করতে পারেনা। তার কফি হাউসে আসার পেছনে অপর্ণার দেখা পাওয়ার ক্ষীণ আশাটুকু মনের গোপনে কাজ করেনি একথা সে হলপ করে অস্বীকার করে কি করে। থাকনা অপর্ণা। ভালোইত। চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবে সেদিনের অপমানের, গ্লানির। প্রায় ফুরিয়ে আসা সিগারেটটা থেকে আরেকটা ধরিয়ে শেষ হয়ে যাওয়া টুকরোটা পা দিয়ে থেঁতলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। উঃ গিস্‌গিস্‌ করছে। ধীরে ধীরে কফি হাউসী চালে এর চেয়ারের ফাঁক দিয়ে ওর গায়ের সঙ্গে ধাক্কাটা বাঁচিয়ে একেবারে উলটো দিকের দেয়ালটার কাছে গিয়ে হাজির হয়।

এদিককার দেয়ালের কাছের যে কোন একটা টেবিলকে ঘিরে ওরা বসতো। হ্যাঁ, সুরঞ্জন আছে। ওর শ্যাম্পু করা কোঁকড়ানো চুল দেখেই চিনতে পেরেছে ওকে। টেবিলের চারধারের ব্যক্তিরা ওর অপরিচিতই। পেছন থেকে গিয়ে প্রবীর সুরঞ্জনের কাঁধে হাত রাখে। মুখ ঘুরিয়ে প্রবীরকে দেখে ও অবাক হয়। আশপাশটা দেখে কোথাও খালি চেয়ার আছে কিনা। ওর নিজের চেয়ারটা ছেড়ে দেয় প্রবীরকে, বলে,

—তুমি বস। আমি একটা চেয়ার নিয়ে আসি। ভালোকথা পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার অনেকদিনের বন্ধু প্রবীর মুখার্জী, দিল্লীতে থাকে। তারপর একজন সম্পূর্ণ বিদেশী পোশাকে আবৃত মুখে পাইপ ওদের বয়সি একজনের সঙ্গে পরিচয় করায়। ইনি বর্ত্তমানের অতি পরিচিত তরুণ লেখক শ্রীঅতুল বন্দোপাধ্যয়। বাংলার বাইরেই থাকেন বেশীর ভাগ। হাত দুটো জোর করে মাথার পাশে নিয়ে নমস্কার করে, প্রবীর সম্মতি জানায়। তারপরের ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় কবায়। ইনি বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীঅমুকের প্রথমপুত্র বাসুদেব বসু। এমনি করে নমস্কার, প্রতি নমস্কারের পালা চুকে যেতে প্রবীর পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই টেবিলের ওপর রাখে। ওদের সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলে,

—কি খাবেন বলুন।

—না, না আপনি খান। আমরা ত একটু আগেই খেয়েছি। বলেন নতুন সাহিত্যিক অতুল।

প্রবীর ইসারায় ওয়েটারকে ডাকে। অর্ডার দেয় পাঁচ প্লেট পকোড়া আর কফির। সুরঞ্জন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আসে। বসতে বসতে বলে,

—তা প্রবীরবাবু, শেষ পর্য্যন্ত কলকাতায় এলে ?

—কেন ? আসবোনা এমন কোন কথা দিয়ে গিয়েছিলাম কি ?

—তা দাওনি। তবে কিছু না বলে কয়েই যখন হুট করে চলে

গেলে, আর গিয়েও যখন কোন চিঠিপত্র দিলেনা তখন এ কথাই কি বুঝতে হবেনা যে তুমি আর কলকাতা মাড়াবেনা এবং আমাদের কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেনা ?

—আমার আসায় কি সেটাই প্রমাণ হয়

—ছুটি ক'দ্দিনের ?

—ভালোলাগার ওপর নির্ভর করছে। তা অতুলবাবু, আপনার সদ্য কি বই বেরুলো ?

—ঐতিহাসিক উপন্যাস। এইতো সেদিন বেরুলো। দাম করেছে বারো টাকা। ভাবতেই পারিনি যে চলবে। সে এক মজার ব্যাপার। লিখছি ত লিখছিই। কোন রকমে আর শেষ করে উঠতে পারি না।

—শেষ নিশ্চয়ই হয়েছিল, নইলে প্রকাশ হত না

—তা ঠিক।

—বাসুদেব বাবু কিছু লেখেন টেখেন নিশ্চয়ই।

—না, আমার বাবাই লেখেন।

—আপনার তবু বাবা লেখেন। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ লিখতো না। এর পরের কথাগুলো ওদের পরিচিত পরিবেশের। প্রবীর সেখানে অপাংক্তেয়। তাই চুপ করে ওদের পর্য্যবেক্ষণ করে আর সিগারেট পোড়ায়। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকায়। অনেক ছেলেমেয়েই চারদিকে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। চোখের পরিধির মধ্যে তাকে খুঁজে পাচ্ছেনা যাকে খুঁজতে তার গোপন বাসনা এখানে তাড়া করে এনেছে।

একটু পরে অতুল উঠে পড়ে। ক্ষমা চেয়ে নেয় তাড়াতাড়ি উঠে পড়ার দরুণ।

—চলি প্রবীর বাবু। আছেন যখন আরেক দিন দেখা হবে।

নীরব সম্মতি জানায় প্রবীর।

—দিল্লীর কথা বলো শুনি। লিখছো টিখছো কিছু ?

তামাদের এখানে এসেছি তোমাদের গল্প শুনতে। আমার কর্মস্থানটা আপাতত ভুলে থাকতে পারলেই খুশী হব।

—দাঁড়াও তোমায় একটা জিনিষ দেখাই। বলে, ব্যাগ থেকে একটা মাসিক পত্রিকা বের করে প্রবীরের হাতে দেয়। এটা ভাদ্র সংখ্যা। আশ্বিনটা এখনও বের হয়নি। সাড়ে চারটে টাকা দিয়ে দেবে বার্ষিক গ্রাহক হিসাবে। কাগজটার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতেই পকেট থেকে টাকা বের করে দেয় প্রবীর।

—সব ত ডক্টরেটদের লেখাতেই ভর্তি অডক্টরেটদের লেখা ছাপাও না বুঝি ?

—না না, তা নয়। প্রবন্ধের দিকটা ওঁদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। হাজার হোক অথরিটি তো। তাছাড়া অন্য লেখা সব নতুনদের। আবার ব্যাগ হাতড়ে একটা কাগজ বের করে প্রবীরের হাতে দেয়। এটা এবারকার পূজো সংখ্যার লেখক সুচী।

—সর্বনাশ। এতো দেখছি বাজারের সব নতুন লেখক !

—ঠাট্টা করছো কেন। নতুনদের লেখাও থাকবে, তবে নামী লেখকদের লেখা ছাড়া পূজো সংখ্যার রিস্ক নেওয়া বুঝতেই পারছো—।

আমার কাছে সব সমান। কি নতুন কি পুরনো। ভালোকথা তোমার কাগজের প্রথম সংখ্যায় আমার নামে নাকি একটা গল্প ছেপেছিলে ?

—তোমার গল্প কি অন্য নামে ছাপবো ?

—কিন্তু, আমি ত কোন গল্প পাঠাইনি !

—তা ত জানি না। তবে গল্প আমি পোষ্টে পেয়েছিলাম। ঠিকানা ছিল কলকাতার, তোমার দিদির বাসার।

—হাতের লেখাটা কি আমার ?

—তা বলতে পারিনা। তবে তোমার নাম দেখেই বাবা ওটা প্রেসে পাঠিয়ে দেন।

—তাহলে প্রবীরবাবু আপনিও লেখেন।

—শুনলেন ত লেখা আমি পাঠাইনি। হয়তো সুরঞ্জনই নিজের গল্প ছাপিয়েছে আমার নামে। বদনাম হলে আমারই হবে।

—তোমার গল্পের প্রসংশা যা হয়েছে তা শুনলে আর ওকথা বলতে না। বেশ কয়েকখানা চিঠি পেয়েছিলাম প্রসংশার। তাতে অনুরোধ জানিয়েছিল তোমার লেখা যেন পরবর্ত্তি সংখ্যায় ছাপানো হয়।

—মন্দ না, কিছু না লিখেও লেখক হওয়া যায়। কে যে আমার এমন উপকার করলো জানতে পারলে ভালো হত। দিও আমায় সেই সংখ্যাটা।

কফি হাউসের আবহাওয়াটা কেমন গুমোট। সিগারেটের ধোঁয়ায় সমস্ত হলঘরটা ধোঁয়াটে। সবার ফিসফিস গুজগুজ শব্দ-সমষ্টি এক তাণ্ডব সঙ্গীতের রূপ নিয়েছে, এ রূপের রূপকাব কে, কে জানে। ওদের বাঁদিকে টেবিলটা খালি হবার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে এসে বসলো। মেয়ে দুটো বসেছে প্রবীরদের মুখোমুখি। অকারণ চোখদুটো বার বার সামনের মেয়েটার শরীরে পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকের সঙ্গে কিছু কিছু বই খাতা। যে মেয়েটা ঠিক প্রবীরের মুখোমুখি, তার পরণে সম্পূর্ণ সাদা পোশাক। শাড়ীর পাতলা আবরণ ভেদ করে তাব শরীরের বেশীর ভাগ অংশটুকুই দৃশ্যমান। নাভীর নীচে কাপড় পরেছে তাহিতি মেয়েদের মত। ব্লাউজটা কোমর থেকে চার পাঁচ ইঞ্চি ওপরে। শরীরের ঐ খোলা জায়গাটায় অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে এবং পড়ছে। প্রবীর চোখ ফিরিয়ে দেখে সুরঞ্জন ওদিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরে প্রবীরকে বলে,—তুমি আমার চেয়ারে বস, আমি বরং তোমারটায় বসি। কয়েকদিন ধরে মেয়েটা এমন জ্বালাচ্ছে যে কি বলবো। প্রবীর জায়গা ছেড়ে দেয় সুরঞ্জনকে। জায়গা বদলাবার পর প্রবীরের মুখোমুখি পড়ে হলঘরের দরজাটা। নির্বিচারে সে কফি—

হাউসের ইনটেলেক্‌চুয়ালদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। থামের পাশের টেবিলে চোখ পড়তেই প্রবীর একটু অবাক হয়। দেখে শীলা। সঙ্গের বাদবাকীদের দেখা যাচ্ছেনা থামের জন্যে। প্রবীর সুরঞ্জনকে কি দেখতে পায়নি ও? তবে? হ্যাঁ, প্রবীরকে দেখেছে। হাত দিয়ে ইসারা করছে প্রবীরকে যেতে।

—একটু আসছি, জায়গাটা রেখ। বলে, প্রবীর চলে যায় শীলার টেবিলের দিকে।

—বসুন। পাশের খালি চেয়ারটা থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে প্রবীরকে বসতে বলে শীলা। আমার বান্ধবী গীতা সোম। ইনি প্রবীরদা ওরফে প্রবীর চৌধুরী কলেজের সহপাঠী। ইনি গীতার বন্ধু প্রকাশ সামন্ত। নমস্কারের পালা চুকলে শীলা বলে,

—কি খাবেন প্রবীর দা হট না কোল্‌ড?

—অনেকদিন পর এখানে এসে যা দেখলাম তাতে ঠাণ্ডা মেরে গেছি কাজেই গরমই ভালো।

প্রবীরই কফির অর্ডার দেয় চারজনের জন্যে।

—সত্যি বলতে কি আমি কিন্তু আশা করিনি আপনি এখানে আসবেন।

—কেন, দিল্লী প্রবাসীরা বুঝি আড্ডা দিতে জানেনা? কখনো দিল্লী গেলে কালীবাড়ীতে যেও, দেখবে কত রকমের আড্ডা সেখানে। আমিও একটু অবাক হয়েছিলাম তোমায় দেখে।

—আমিও এসময়ে রোজই আসি। স্কুল ছুটির পর এখান থেকে কিছুটা মবিল সংগ্রহ না করলে বিকেলের লক্ষ্মীপূজো বন্ধ হয়ে যাবে।

—এসেই আমাকে দেখতে পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—ডাকলে না কেন?

—আপনি পেছন ফিরে ছিলেন। আর—

—থাক্ বুঝেছি। তবে এতদূর গড়িয়েছে জানতাম না। আমি

এখানে থাকলেও হয়তো এরকম ঘটনা ঘটতো, অতি আপনজনদের দেখেও মুখ ফিরিয়ে নিতাম। বেঁচে গেছি বাইরে চলে গিয়ে।

—সে রকম বেঁচে যাবার জন্যেই তো পালালেন। সোনালী আপনার জন্যে যা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। ওর ছটফটানি দেখলে আপনি নিশ্চয়ই পালাতে পারতেন না।

—সত্যি ?

—বিশ্বাস না হয় ওর সঙ্গে দেখা করলেই বুঝবেন। বিয়ে হয়ে গেছে তবুও আসে মাঝে মাঝে আমার কাছে। সপ্তাখানেক আগেও এসেছিল। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিল আপনার কোন খবর রাখি কি না।

প্রবীরের মনে পড়ে সোনালীর কথা। বড়লোকের মেয়ে। তার ওপর কলেজে ওই তখন সবচেয়ে সুন্দরী। তবে ওর সৌন্দর্যে কোন আকর্ষণ ছিল না। প্রবীর মিশতো ঠিকই, কিন্তু ঘনিষ্ঠ হয়নি কখনো। ওর সেদিনকার চলাফেরায় কল্পনাই করতে পারেনি যে ও প্রবীরের প্রতি আসক্তা।

—কি ভাবছেন ?

—পুরনো দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিলে খুব খারাপ লাগে, নিজেকে কেমন ছোট মনে হয়।

—আপনি দিল্লীতে কোথায় থাকেন ? বলে, গীতা সোম।

—মামার কোয়ার্টারে, কনট প্লেসে।

—ছুটির দিনগুলো কি করেন ?

—ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই।

—এত সব দেখার জিনিষ, আর আপনি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেন। আমি হলে এখান থেকে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম।

আপনার মতো দিল্লীতে অনেকেই আছেন, যারা ছুটির দিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সত্যিই তারা ঘুরে বেড়ায় তবে দেখে না কিছুই।

—তার মানে ?

—ঠিক বোঝাতে পারবো না আপনাকে। পুরনো নিদর্শনগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলে খুব পরিচিত হয়ে পড়ে কয়েক দিনের মধ্যে। তখন লোকে সেখানে পিকনিক করে, ইতিহাসের ছায়ায় তাদের অলস সময় কাটায়। দেখা দুরকমের। এক-বস্তুর কাঠামোটা দেখা, আর এক উপলব্ধি করা। বস্তুর কাঠামো দেখা কয়েক দিনেই পুরনো হয়ে যায়। উপলব্ধি করার জন্যে প্রয়োজন চোখ বুঝে ডুব দেওয়া। আগ্রায় যতবারই গেছি বারবার বাইরে থেকে ফিরে এসেছি। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আগ্রায় আমি কম করে কুড়ি পঁচিশ বার গেছি। থেকেছিও কয়েকদিন করে, কিন্তু তাজমহল দেখেছি একবার। হ্যাঁ শুধু একবার এক অন্ধকার রাতে। আমার সে দিনের দেখা তাজমহলের ছবি আমার মনে যেরকম ছায়া ফেলেছে, অন্য দিনের দেখা যদি তার পরিবর্ত্তন আনে—সে ভয়েই আর যাইনি। দিনের পর দিন শুধু ভেবেছি সেই অন্ধকারে দেখা তাজমহলকে।

—আপনি দেখছি সত্যিকার কবি। বলে প্রকাশ সামন্ত।

—মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছেন।

—জানেন প্রবীর দা, প্রকাশবাবু নাম করা কবি।

—সর্বনাশ। ওখান থেকে সাহিত্যিকদের ঠেলায় এখানে পালিয়ে এলাম। আর এখানেও! সুরঞ্জন সাহিত্যিক, অতুল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক, বাসুদেব বসুর বাবা সাহিত্যিক।

প্রবীরের বলার ধরণে সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

—আমার কি মনে হয় জানেন প্রকাশবাবু, ভাবনার ডানাটা মেলে যেখানে খুশী উড়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সেই ভাবনা গুলোকে শব্দের মাধ্যমে রূপ দিতে গেলেই ডানা ভেঙ্গে মাটিতে ধপাস। জানেন তো বাস্তবতা না থাকলে লেখার মূল্য থাকে না। তাই আমি ভাবি, লিখি না।

—যেদিন ভেতর থেকে তাড়া আসবে, সেদিন না লিখে পারবেন না।

—তাড়া খেয়েছি বলেই তো লিখি না।

—কে তাড়া করলো ?

—এই যে শীলা, এরা সবাই মিলে তাড়িয়েছে।

—ভালো হবে না বলছি প্রবীরদা, সব ফাঁস করে দেবো। কপট রাগ দেখায় শীলা। শীলার রাগ দেখে মাপ চাওয়ার ভঙ্গীতে প্রবীর হাত জোড় করে। গীতা সোম বলে,

—বলুনা ভাই ব্যাপারটা। কেমন রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি। কি যেন নামটা, সোনালী না রূপোলী কি যেন ?

—সোনা নয় রূপোও নয়, স্রেফ দস্তা।

—তাই হোক।

—তার চেয়ে আপনার কথা বলুন শুনি।

—আমার আবার কি কথা! আগ্রা যাইনি দিল্লীতে যাইনি। কলকাতার গলিতেই যাতায়াত শেষ। এখানেই বয়স বাড়বে, আর এখানেই পটল তুলবো।

—কেমন আক্ষেপের সুর বলে মনে হচ্ছে।

—ও সব কিছু না। দেখতে না দেখতেই বড় হয়েছি, দেখতে না দেখতেই ফুরিয়ে যাবো।

—শীলা, যাবার সময় আমায় ডেকে নিও। তোমার সঙ্গে একটু দরকারি কথা আছে। প্রবীর উঠে পড়ে

—আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই উঠবো। সেই বুঝে উঠে আসবেন।

প্রবীর আবার টেবিল বদলায়। কেমন এক অসহ্য অস্বস্থি ওকে স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না। সুরঞ্জনরা তেমনি মশগুল হয়ে আড্ডা দিচ্ছে আর চারমিনার-এর ধোঁয়া উড়িয়ে সাহিত্যের বাজার গরম করছে। নতুন একজন কে দখল করেছে অতুলবাবুর জায়গাটা। প্রবীর গিয়ে বসে।

—কি হে কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

—কোথায় ছিলাম তা তো জানো। অথচ ভাবখানা যেন কিছুই জানো না। অভিনয় তুমি ভালোই কর তা তোমার কিছু হলো ?

—বুঝলাম না।

—যার জন্যে জায়গা বদল করলে।

—ও হো, তাই বলো।

—আমাদের টেবিলটা কেমন নিরস। যাও না, ডেকে নিয়ে এসো। কি যেন নাম ?

—সফেনা সামুদ্রী।

—বাংলা শব্দ ?

—বুঝবে না। এসব আঁতে লেফ্‌টুও নাম।

—যাক, আমি আজ চলি। পারতো দেখা করো।

—এখানে আমি রোজ থাকি। এখানেই কাল এসো।

—চেষ্টা করবো।

বিল মিটিয়ে দিয়ে প্রবীর বের হবার সময় শীলাকে ইসারা করে বাইরে সিঁড়ির মুখটায় এসে দাঁড়ায়। একটু পরেই শীলা এবং গীতা এসে পড়ে। প্রকাশবাবু সম্ভবতঃ অন্য কোন টেবিলে জায়গা করে নিয়েছেন। কফি হাউস থেকে বেরিয়ে গীতা বলে,

—চলি প্রবীরবাবু। আপনাদের কথায় এখন আমার থাকা উচিৎ নয়। হেসে নমস্কার করে বিদায় নেয় ও।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? কোথায় যাবেন চলুন।

—তোমার টিউশন আছে না ?

—থাকগে, রোজই তো যাই। আজ না হয় নাই গেলাম।

—চল, কলেজ স্কোয়ারেই বসি। চলতে চলতেই প্রবীর প্রশ্ন করে। সুরঞ্জন তোমার সঙ্গে কথা বলে না ? তোমাদের দুজনকে দেখে মনে হল তোমরা একে অন্যকে চেন না।

—সে অনেক কথা, নাই বা শুনলেন। দোষ কারুর নয়, দোষ

আমার। আপনি কেন পরীক্ষা না দিয়ে দিল্লী পালিয়েছিলেন? একটা প্রমিসিং ফিউচারকে নষ্ট করে দিলেন?

—সেতো অনেকদিন হয়ে গেছে। তা ছাড়া তোমরা তো সবই জানো, না জানলেও বুঝতে পারো নিশ্চয়ই?

—তা পারি। এবং পারি বলেই হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম। আপনি থাকলে কি হোত জানি না। তবে আপনি চলে যাওয়ায় আমার খুব ক্ষতি হয়েছে। শীলা চুপ করে দূরের আলোগুলি জলের ওপর কেঁপে কেঁপে উঠছে তাই দেখছে। প্রবীর ইচ্ছে করেই শীলার সেই তন্ময় ভাবটা কাটায় না। পরিচয় যথেষ্ট থাকলেও এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে ওরা তুজন কখনো পাশাপাশি বসে নি। হাল্কা নীল রঙের শাড়ীটা, বিকেলের শেষ আলোটুকু বিদায় নেবার জন্যে বেশ কালো দেখাচ্ছে। কয়েক গুচ্ছ চুল উড়ে এসে প্রবীরের গায়ে আছড়ে পড়ছে। শীলা যে এত সুন্দর এর আগে কখনো ভাবেনি প্রবীর। চুলের হাল্কা গন্ধটা প্রবীরকে কেমন মোহগ্রস্ত করে তোলে। শীলার নীরবতা ভাঙবে একথা ভেবে নিঃশ্বাস ফেলছে খুব ধীরে ধীরে। শীলাই নীরবতা ভাঙে।

—চুপ করে আছেন যে?

—তুমিই তো বলতে বলতে থেমে গেলে। তোমার যদি কষ্ট হয় তা হলে বলো না।

—কষ্ট নয়। কেমন যেন চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগছে। ঘুমিয়ে ওঠা থেকে আবাব ঘুমনো পর্য্যন্ত কেমন যেন সব ছকে বাঁধা। বিকেলের সময়টুকু যা কফি হাউসে কাটছে আড্ডা দিয়ে। তাও কেমন যেন আজকাল বিঃস্বাদ লাগে। ইচ্ছে করে কোথাও বেরিয়ে পড়ি কিছু দিনের জন্যে।

—ভালোই তো।

—ভালো তো আমিও বুঝি কিন্তু যেতে পারি কই। আমার ওপর নির্ভর করে আছে যে।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। সুরঞ্জনেব সঙ্গে তোমার ঝগড়া হল কেন ?

—ঝগড়া হয়নিতো ; আমিই করে এসেছি।

—কেন ?

—আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যে। আপনি চলে যাওয়ার পর ও অপর্ণার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে।

—কেন, প্রফেসর বোস ?

—আপনিতো জানেন, ও একজনের সঙ্গে বেশীদিন মিশতে চায়না। সখ মিটে গেলেই সরে পড়বে। সুরঞ্জন অপর্ণা এ দুটো নাম তখন কলেজে খুব চালু। কলেজের থিয়েটার থেকে আরম্ভ। তখন থেকে সুরঞ্জন আমায় অবহেলা করতে সুরু করে। আপনিই বলুন ভালোবাসা কি জোর করে আদায় করা যায়? তাই আমি সরে এসেছি। আপনি ভালোই করেছিলেন চলে গিয়ে।

—অপর্ণা তাহলে এখনও—।

—না।

—চল ফেরা যাক।

—এত তাড়াতাড়ি ? আপনার জন্যে টিউশান করতে গেলাম না আর আপনি এখনই চলে যাবেন।

—তা না, তোমার দেরি হবে বলেই বলেছি। প্রবীর সামলে নেয় নিজেকে।

কেমন করে যেন একথা সেকথার পর এক সময় অপর্ণার কথা উঠবেই। সব রাস্তাই যেন রোমে গিয়ে পৌছেছে। অতীতের কোন অন্তরঙ্গের সঙ্গে দেখা হলে মনটা খুশী হয়ে উঠে অথচ অতীতের ঘটনা মনটাকে এত বিপর্য্যস্ত করে তোলে কেন কে জানে। যার কথা ভাবছে, যার কথা মনে এলে একটা যন্ত্রণা, একটা দাহ— সে কি অনুভব করে তা! করে না। তবে কি প্রবীর অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসার সুযোগ পায়নি বলেই এখনও অপর্ণার কথা

ভেবে কষ্ট পায়? অপর্ণার মত, সুরঞ্জনের মত জীবনে দৃশ্যান্তর ঘটাতে পারলে আজ হয়তো ভুলেই যেত পুরনো ভালোবাসার স্মৃতি। পরিতোষ ভুলতে পেরেছে, সমীরণ ভুলেছে। হাসি পায় প্রবীরের এই সমীরণের কথা ভেবে, আধুনিক কবি। অপর্ণার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গাদা গাদা কবিতা লিখতো আর তা রাত বারোটার পরে! সুরঞ্জনও নিশ্চয়ই ভুলেছে আজ অপর্ণাকে। শুধু প্রবীব পারেনি। সবারই পালা বদল হয়েছে। ও-ই শুধু অভিনয় শেষ হয়ে যাওয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে এখনও অভিনয়ের কথা ভেবে চলেছে, হাসি কান্না, দুঃখ সবই উপলব্ধি করছে। আসলে সে একজন পরিপূর্ণ ভীরু, কাপুরুষ। নইলে একটা টোটাল 'ফান'কে সে কিনা সিরিয়াস ভেবে বসে রয়েছে এখনও। বুঝতে পাবে না কোনটা সত্যি।

শীলা সুন্দরী। দূরের ছিটকে পড়া আলোয় ওকে আরো মোহময়ী করে তুলেছে, এত কাছে যে, ওর চুলেব গন্ধ মনটাকে আবিষ্ট করে তুলছে। প্রবীব কি ওকে পরিপূর্ণ ভাবে পেতে পারে না? প্রবীরের প্রতি ওব যদি দুর্বলতাই না থাকে—তবে? আজ যদি সোনালীর বিয়ে না হতো তাহলে প্রবীর সোনালীকে গ্রহণ করতো। কেমন হয় শীলাকে ভালোবাসলে? কেমন যেন মনের সঙ্গে সমস্ত শরীরটা ছটফট করে ওঠে। ভালবাসাটা কি ব্যবসা নাকি যে চেষ্টা করলেই হবে।

—কি হল চুপ করে রইলে যে।

—মনে হল আপনি যেন কি ভাবছেন, হয়তো অপর্ণার কথা, তাই—।

—খালি অপর্ণা অপর্ণা আর অপর্ণা। এছাড়া কি আর কোন নাম তোমাদের মনে পড়ে না? বিশ্রী লাগে ওর নাম শুনলে। চল, এখান থেকে উঠি, কেমন যেন ভীড় বেড়েই চলেছে।

—কোথায় যাবেন?

—তোমাব যেখানে খুশী।

—যাবেন? আমি মাঝে মাঝে একটা জায়গায় বসি। সুন্দর জায়গাটা।

কলেজ স্কোয়ারের ভীড় থেকে ওরা বেরিয়ে পড়ে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত তখন সাতটা। বাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্সি যেতে দেখে দাঁড় করায়। দরজা বন্ধ কবতে কবতে প্রবীব বলে, কোথায় যাবে বলে দাও। শীলা গন্তব্যস্থান বলে দেয়। গাড়ীতে উঠে শীলা সিটের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দেয়। রাস্তার আলোগুলো এক এক ঝলক আলো ফেলে সরে যাচ্ছে। প্রবীর দেখে শীলা চোখ বুজে রয়েছে।

—আচ্ছা প্রবীরদা, আপনি আমাকে কি মনে করেন?

—তুমি আমাব সম্বন্ধে কি মনে করো? পাল্টা প্রশ্ন করে প্রবীর।

—আমার ব্যবহারেই বুঝে নিন না কেন।

—বুঝলাম না। আগে তোমাকে দেখেছি, তবে ঠিক অনুভব করেছি—বলতে পারিনা। এখন তোমাকে দেখছি, মনে হচ্ছে তোমায় যেন কিছুটা চিনি। তোমার ভেতরে যে দুঃখ অভিমান জমাট হয়ে রয়েছে; ইচ্ছে করে তার কিছুটা ভাগ নিই। তবে—

তবে কি?

—কোথায় যেন বাধা। থাক্‌গে।

শীলার নির্দেশে গাড়ীটা এসে স্টেডিয়ামের পাশে দাঁড়ায়। শীলা ব্যাগ খুলতে যাচ্ছিল দেখে প্রবীর বাধা দেয়। নিজেই দিয়ে দেয় ভাড়াটা।

—আপনি দিলেন কেন? আমিই তো নিয়ে এলাম আপনাকে।

—চল কোথায় যাবে।

—চলুন।

দুজনে সামনে বিস্তীর্ণ ঢালু জমিটার দিকে এগিয়ে যায়। প্রবীর কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। শীলাও জানেনা এ জায়গাটা প্রবীরের কত পরিচিত।

প্রবীর কেমন যেন নির্বোধের মত ভাবতে আরম্ভ করেছে অপর্ণাকে। অনেক সন্ধ্যা শুধু একটি সন্ধ্যাতারার সান্নিধ্যে কেটে গেছে। আজ, যে অপণার কথা শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, ঘৃণায় মনটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠে, সেদিনকার অপর্ণায় তার কোন ছাপ ছিল না। সেদিন কেমন দুজনেই চুপচাপ বসে থাকতো অনেক্ষণ। ভুলেও সেই নিস্তব্ধতাকে কথা বলে নষ্ট করতো না। আজ, কে কোথায়।

প্রবীর এখানে বসে আসে অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে। অপর্ণাও তাই। দুদিন পরে শীলার জায়গা নেবে অন্য কোন মেয়ে। তাহলে' অপর্ণার সঙ্গে ওর তফাৎ কিছু নেই? আজ হয়তো প্রবীরের সজ্ঞান মন বলে উঠবে, শীলার দুঃখে সান্ত্বনা দেবার জন্যই প্রবীর তাকে কিছুটা সাহচর্য্য দিচ্ছে। চূড়ান্ত শয়তান যে সেও তো তার অপরাধের একটা না একটা কৈফিয়ৎ দিবে। তাছাড়া একটু আগেও সে শীলাকে এবং সোনালাকে মনে মনে চেয়েছে। তবে? নিজের ওপরই কেমন এক ঘৃণার সঞ্চার হয়। তাহলে এই যে প্রেম ভালোবাসা এসবের পেছনে এক উলঙ্গ বাসনাই শুধু কাজ করে। তবু, তবু যেন প্রবীরের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করেনা যে ভালোবাসার সবটুকুই দৈহিক কামনা। অস্বীকারও করতে পারেনা আর নির্বিবাদে স্বীকারও করতে পারেনা।

শীলা প্রবীরের গা ছুঁয়ে বসেছে। ভালোই লাগছিল এতক্ষণ। শীলাও হয়তো সেই নীরব অনুভূতিটাকে সরব করে তোলেনি। হঠাৎই কেমন নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে করতে থাকে প্রবীর। ওর ছোঁয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে শীলা ভাববে এটা প্রবীরের ন্যাকামী। কারণ নির্জনতাকে বেছে নেবার আর কোন যুক্তিই ও খুঁজে পাবেনা।

—চল, ফিরবো।

—এখন?

—হ্যাঁ। মনেই ছিলনা, আজকে বাড়ীতে লোক আসবে। কিছু মনে কর না লক্ষ্মীটি, কাল পরশু তোমাদের বাড়ীতে অথবা কফি হাউসে দেখা করব। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শীলা বলে,—চলুন।

অনেকে ভাবে সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর রাতে পাবে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। অনেকে সেরকম রাতের বিশ্রাম চায়, কিন্তু পায়না। চার পাশের লোকগুলো যখন ঘুমের কোলে আশ্রয় নেয়, তখন অজস্র চিন্তা সাপের মত কিলবিল করতে থাকে. সে চিন্তার কোন রূপ নেই। মনে হয় যেন ভাবছে অথচ কিছুই ভাবছে না। অনেকটা সুরাসক্ত মনের ওপর অনেক স্মৃতির অসংলগ্ন পদচারণের মত। দিদি, জামাইবাবু ও অমিতের সঙ্গে ঘণ্টাদুয়েক সময় ভালোই কেটেছে। ওরা ঘুমিয়েছে আর প্রবীর জেগে আছে। কে জানতো দীর্ঘ সময়ের অনুশাসনও ওর মনকে বশে আনতে পারেনি। নিশ্চিন্তে শরীরটাকে বয়ে নিয়ে যাবে শ্মশানঘাট অবধি তাতেও কত সময়ের কারচুপি, কত রকম অব্যবস্থা। জীবনটা ভালোভাবে তলিয়ে দেখার আগেই জীবন সম্বন্ধে ওর এই বিতৃষ্ণা লোকের কাছে ওকে হেয় করে তোলে, অন্তত যারা জীবনটাকে উপভোগ করতে চায়।

এখান সেখান করে যখন দিল্লী গিয়ে পৌছয়, তখন রাস্তাঘাট মানুষজন সবই ওর কাছে ছিল নতুন। কলকাতার কোন কিছুর সঙ্গে যেন তার কোন মিল নেই। কলকাতার কর্মব্যস্ততায় ছিল খাতার ওপর হিজিবিজি কাটার মতো। দিল্লীতে তা কতগুলো সবল সরল রেখার মত, পুরনো দিল্লীর ঐতিহ্য নতুন দিল্লীতে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে, প্রবেশের অনুমতি পায়নি। পথ ঘাট সব মাপা মাপা। বাড়ীঘর আর বাসিন্দারা পর্যন্ত সেরকম। সদ্য পরিচিত এক বন্ধুকে নিয়ে সে একদিন বেড়াতে বেড়াতে কনট সার্কাসে গিয়েছিল সন্ধ্যা কাটাতে। খোলা চোখেই দেখেছিল জীবনটা কেমন বেচাকেনার সামগ্রী হয়ে পড়েছে। সেই বন্ধুই তাকে বলেছিল জীবন সম্বন্ধে কত রম্যরচনা। এক ভদ্রলোক তার

স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে এসেছিল পার্কে। স্বপ্নলোকিত পার্কের একটি বেঞ্চিতে বসেছিল ওরা কিছুক্ষণ। তারপর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে স্ত্রী চলে যেতে স্বামী ভদ্রলোক পার্ক থেকে বেরিয়ে যান। প্রবীরের অবাক চোখের তারার দিকে তাকিয়ে বন্ধুটি শুধু অর্থপূর্ণ হেসেছিল। সেই দিল্লীতে, যেখানে যৌবনের তরঙ্গটাই প্রধান সেখানে থেকেও সে এমন হয়ে গেল কেমন করে। শীলার গোপন মনের লেখা কি প্রবীর আজ উপলব্ধি করতে পারেনি? তবে, তবে তার এই উন্মাষিকতার কি মানে আছে। দুদিনেব জন্য কলকাতায় বেড়াতে এসে জমা খরচের খাতায় শুধু শূন্যটাই নিয়ে যাবে? আদর্শ, নীতি এসব কিছুই বাজে।

দুপুরের বিশ্রাম করতে গিয়ে প্রবীরের কেন যেন মনটা ছটফট করতে থাকে। ওর মনটা যেন কি এক আকূল আবেগে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। জামা কাপড় পরে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে যাতে দিদি বুঝতে না পারে। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় কফি হাউসের দিকে। ঘর থেকে বেরিয়েই ও বুঝতে পারে নির্দ্দিষ্ট কোন জায়গা নেই যেখানে গিয়ে সময় কাটাতে পারে। কফি হাউসে গেলে হয়তো কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। অন্ততঃ সুরঞ্জনের সঙ্গে ত বটেই। তা ছাড়া এক অদম্য কৌতুহল রয়ে গেছে ওর নামে ছাপা গল্পটার প্রতি। কফি হাউসের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনতে কিনতে ওর মনে পড়ে শীলার কথা। যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তবে? সুরঞ্জন কাল খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করেছে, ও শীলার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে আর ফেরেনি কফি হাউসে। সুরঞ্জন কি মনে করেছে কে জানে। প্রবীর অপর্ণার সেই ঘটনাটা একদিন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে সুরঞ্জনকে বলেছিল। জীবন সম্বন্ধে অতি সচেতন সুরঞ্জন কি আজ সে রকম কিছু ভাববে না—শীলাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে?

সিড়ির গোড়া থেকেই প্রবীর ফিরে যায়। বাস ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে

ভাবতে থাকে কোথায় বা কার কাছে যাওয়া যায়। বন্ধুদের পরিবেষ্টন ছেড়ে বাইরে যাবে কি করে, একথা যে একদিন ভেবেছিল, আজ সে নিজেকে নির্বান্ধব ভাবছে। ওর ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসাটা অনেকের সতস্ফুর্ত আহ্বানে পূর্ণ হয়নি। চৌরঙ্গী গামী বাসে চাপে ও। ঠিক করে ফেলে সিনেমায় যাবে। এমনি করে যে ক'দিন চলে তাতেই লাভ। ভালো না লাগলে ছুটি থাকতেই পাড়ি দেবে দিল্লীর পথে।

ঘুরতে ঘুরতে এলিটে এসে টিকিট কেনে। একটা যুদ্ধের বই। অন্ধকার হলে নিশ্চিন্তে পেরিয়ে যায় কুড়ি পাঁচশ বছর আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক পটভূমি। একদিকে জার্মান, যাদের পশুর পর্য্যায়ে নামিয়ে এনেছে ; অন্য দিকে মিত্র শক্তি, সভ্য মানুষদের প্রতিনিধি। পশুকে ধ্বংস করে সভ্যদের পৈশাচিক উল্লাস ভরা দৃশ্য প্রবীরের বাস্তব বোধকে সাময়িক ভাবে ভাবিয়ে রাখে। প্রবীর অবশ্য এসব ভাবে না। ওর ভালো লাগে এসব মারামারি কাটাকাটির বই দেখতে। ছবি শেষ হতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হল বিজাতীয় সহযোগে। শুধু তাই নয় স্বাদেশিকতার প্রথম পাঠ নাকি এই। সেই পাঠ নেবার ভয়ে বই শেষ হবার একটু আগেই কিছু লোক উঠে যায়। শুধু হলের দরজাটা বন্ধ থাকে বলে বেরিয়ে যায় না, প্রবীর হাসে। উলঙ্গ সত্যটাও কেমন আবরিত। জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন কলেজের এক ঘটনার কথা ওর মনে পড়ে যায়। স্বাধীনতা দিবসের দিন হেয়ার স্কুল গ্রাউণ্ডে এক অর্দ্ধ মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। যিনি জাতীয় সঙ্গীতের গোটাদুই লাইন ছাড়া আর কিছু জানতেন না অথচ সঙ্গীতের প্রশস্তিতে মুখরিত ছিলেন অনেক্ষণ। ভীড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবীর এগোতে থাকে দরজার দিকে। হঠাৎ কাঁধে একটা হাত পড়তেই চমকে পেছন ফিরে দেখে অর্ণব। ওর ছোট বেলাকার বন্ধু। মনটা খুশী হয়ে ওঠে ওকে দেখে। আর যাই হোক অর্ণব

ওর পরিণত বয়সের বন্ধু নয়। কিছুক্ষণ আগে যে নিজেকে নির্বান্ধব ভেবেছে এখন আর সেরকম মনে হচ্ছে না। অর্ণব সেন বড় লোকের এক ছেলে। স্কুলে দুজন এক সঙ্গে পড়তো। প্রবীরের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বে কোন ফাঁক ছিল না, যেমন থাকে কলেজ জীবনের বন্ধুত্বে। স্কুল ছাড়ার পর কলেজে ভর্ত্তি হবার সময়েই দুজনে আলাদা হয়ে যায়। প্রবীর প্রেসিডেন্সিতে আর অর্ণব সিটিতে। কলেজ আলাদা হলেও দুজনের বন্ধুত্বে ফাটল ধরেনি। আজ প্রবীরের স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে প্রবীরই অর্ণবকে এড়িয়ে চলতে থাকে কলেজ জীবন আরম্ভ হবার কিছুদিন পর থেকে। বর্তমানে সেই কারণটা যদিও কিছু নয়, তখন সেই কারণটাকে একটা বিরাট কিছুই ভেবেছিল। অর্ণব দেখতে ছিল গোলগাল সুবোধ বালকের মতো। থিয়েটার দেখতে এবং করতে ভালো বাসতো। সেই কারণেই কিনা জানি না মেয়েদের প্রতি ওর ধারণাটা স্বভাবতই কেমন অসংযত। মেয়েরা ভালো নয় এটাই ছিল ওর ধারণা। তাছাড়া বিয়ের আগে, যে মেয়েরা কোন পুরুষকে ভালোবাসতো, তাদের সম্বন্ধে ওর কুৎসিৎ মন্তব্য প্রমাণ করতো ওদের প্রতি ওর ধারণা। সেই কারণেই প্রবীর এড়িয়ে চলতো অর্ণবকে। দেখা হলেও কখনো অপর্ণা সম্বন্ধে কিছু বলতো না। তাতেও রেহাই পেতনা ওর কাছ থেকে। কো-এডুকেশন কলেজে পড়ার দরুনই যে প্রবীর এ রকম সৃষ্টি ছাড়া হয়ে যাচ্ছে এতে আর যারই দ্বিমত থাক অর্ণবের ছিল না। আজ অর্ণবের সঙ্গে দেখা হয়ে প্রবীরের ভালোই লাগছে। ইচ্ছে করছে বিগত দিনের সব কিছু খুলে বলে নিজেকে হাল্কা করে নেয়।

—কবে ফিরলি ?

—ফিরিনি, বরং মাস খানেকের মধ্যে ফিরে যাবো। দু'তিন দিন হল এসেছি। কথা বলতে বলতে হল থেকে বেরিয়ে পড়ে দুজনে।

—না ফিরলেই পারতিস। কে তোকে মাথার দিব্বি দিয়েছিল আবার কলকাতায় আসতে।

—কালকেই চলে যাবো।

—তাই না। পালিয়ে যাবার চাইতে বলে যাওয়াই ভালো। আর কিছু না হোক আরও খানিকটা মোটা হতে পারবি। যাই বলিস না কেন, তোর মত স্বার্থপর আমি আর দুটো দেখিনি।

—ঝগড়া পরে করতে পারবি। তার জন্যে তোকে অফুরন্ত সময় দেবো। এখন চল একটু চা খেয়ে নিই।

—তোর অফুরন্ত সময় থাকলেও আমার সময় নেই তোর সঙ্গে কথা বলার।

—এমনি বলছিস, না রাগ করে বলছিস।

প্রবীর অর্ণবকে টানতে টানতে আর্মেনিয়াতে নিয়ে যায়। অর্ণব বসেই ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি সত্যিই বেশীক্ষণ বসতে পারবো না।'

—সেকিরে! এ্যাদ্দিন পর তোর সঙ্গে দেখা হলো আর তুই কিনা—। যাকগে—।

—তোরতো এখন কোন কাজ নেই, না? চলনা আমার সঙ্গে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

—বিজনেস্ টক্?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তুই একাই যা। ওসব ব্যবসা আমার মাথায় ঢোকে না।

—তোকে যখন পেয়ে গেছি তখন ছাড়ছি না।

—ব্যাপার কি বলতো?

—তুই নিজেই বুঝে নিতে পারবি একটু পরে। সাতটায় তার সঙ্গে দেখা করার কথা।

—কে সে?

—এক ভদ্রমহিলা। তুই চিনবি না। অবশ্য ইদানিং কলকাতায় থাকলে তোর সঙ্গে পরিচয় নিশ্চয়ই হোত। কি বলবো,—প্যারাগন।

—তোর আবার মেয়েদের দিকে নজর গেল কবে থেকে ?

—তুই কি ভেবেছিস আমি এখনও খোকা ? যাকগে তোকে প্রিফেসটা বলেনি। একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রবীরের দিকে তাকাতে গিয়ে বলে, ওরকম ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছিস যে ?

—মানে, আমি জানতাম তুই থিয়েটার দেখিস।

—শুধু যে নাটক করি তাই নয়, লিখিও।

—তাহলে তুই কি আমায় রিহার্সাল-এ নিয়ে যাবি ঠিক করেছিস ?

—অনেকটা সে রকম।

—তাহলে আমায় ছেড়ে দে।

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায় পয়সা দিতে। তারপর আবার রাস্তায়। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অর্ণব প্রবীরকে অনেক কিছুই বলে। তবে যার সঙ্গে দেখা করতে যাবে তার কথা কিছুই বলেনা। ইচ্ছে প্রবীরকে তাক লাগিয়ে দেবে।

—বেশ কিছুদিন ধরে অনুভব করছি কেউ যদি সবসময়ের জন্যে কাছে থাকে তাহলে যেন ভালো হয়।

—বিয়ে করে ফেল।

—তুই একটা গবেট হয়ে গেছিস।

—বড্ড দেরিতে বুঝি আজকাল সব। তাহলে সেই প্যারাগন ?

—হ্যাঁ-রে, হ্যাঁ। বিশ্বাস করবিনা সেই থিয়েটারই আমার কাল হল। কি যে হোল, কোন রকমে ভুলতে পারছিনা ওকে। যদি জানতাম যে ও আমাকে ভালবাসে তাহলে একটা ডিসিশন নিতে পারতাম।

—তুই একাই যা। এসব ক্ষেত্রে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

—সে জ্ঞান আমায় না দিলেও চলবে। যে কথাটা আমি হয়তো বলতে পারবো না, সেটা হয়তো তুই জেনে নিতে পারবি। ও যদি রাজি থাকে তাহলে বাবাকে বলে বিয়ের ব্যবস্থা করে নিতে পারি। তাছাড়া তোর সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে রাখা যাবে। হাজার হোক তুই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

অগত্যা প্রবীর অর্ণবের সঙ্গেই হাঁটতে থাকে। এ যদি অর্ণব না হয়ে অন্য কেউ হত তাহলে প্রবীরের মাথা ব্যথার কোন কারণ ছিল না। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে ওকে, মেয়েদের সম্বন্ধে ওর কি ধারনা তাও জানে।

—কি ভাবছিস্ রে?

—ভাব্‌ছি তোর অধঃপতনের কথা।

—তুই বড্ড সেকেলে রয়ে গেলি। হরদম শুনি যে সাহিত্য যারা করে তারা আবার প্রেমের পাগল।

—না রে হিংসে করতে ইচ্ছে করছে তোকে।

—তা হিংসে কর আর যাই কর ওদিকে নজর দিবি না। তোর বাপু অভ্যেস আছে মিষ্টি কথায় মেয়েদের মন ভোলানো। এক্ষেত্রে যদি ওরকম কিছু করিস তবে কাটাকাটি হয়ে যাবে বলে রাখছি।

—তাহলে আমি চলি, কেমন? বলে, প্রবীর সত্যি সত্যি উলটো দিকে চলতে থাকে। অর্ণব সঙ্গে সঙ্গে প্রবীরের জামাটা চেপে ধরে।

—আচ্ছা বেইমান ত তুই! জীবনে এই প্রথম একটু ইয়ে, মানে কোথায় সাহায্য করবি তা না মেজাজ দেখাচ্ছিস। জানিস ত জাবদা খাতার চর্চা করে কথাবার্ত্তা গুলো খট্‌খটে হয়ে গেছে। তোদের মত সাহিত্য করলে মিষ্টি কথাতেই তোর কান কেটে নিতাম।

তুই যে নাটক লিখিস বল্লি!

—তাতে হয়েছে কি?

—না, মানে সেটাও ত সাহিত্য। তা ওদিকে চল্লি কোথায়?

—সিসিলে।

—সিসিলে? ওটাত বার।

—তাতে হয়েছেটা কি। তুই কি বৈষ্ণব ঠাকুর যে ছুঁলেই তোর জাত যাবে। তোর ভাল না লাগে অন্য কিছু খাস।

—তোর ফিঁয়াসীও কি গ্লাসে চুমুক দেয়?

—ওদের সোসাইটিতে এসবের প্রচলন আছে।

—কি জানি হবে।

প্রবীর যেন খুব সহজ ভাবে নিতে পারল না অর্ণবের এই সহজ স্বীকারোক্তিটা। ভাবতেই পারছে না অর্ণবের জীবন-পথের পরিবর্ত্তনটা। মেয়েটাই কি তাহলে এ পথে এনেছে অর্ণবকে? এ কখনো হতে পারে না। সরাসরি মেয়েটাকে প্রশ্ন করবে। সম্ভব হলে এমন মেয়ের সঙ্গে যেন অর্ণব মেলামেশা না করে।

দুজনে লাটভবনের নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে ডালহৌসির দিকে। অফিস ফেরতা লোকগুলো সাত তাড়াতাড়ি বাড়ী পলানোর জন্য সব চেয়ে জনবহুল জায়গাটা কেমন নির্জন হয়ে এসেছে। দুজনে লিমটনের ঘড়ির দোকানটা পেরিয়ে যায়। তারপর লালবাজার। বেন্টিক ষ্ট্রীট পার হয়ে বাঁ দিকের দোকানটায় ঢুকে পড়ে। আগে অর্ণব পরে প্রবীর। প্রবীর কেমন অবাক চোখে দেখতে থাকে। এ জগত তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। ঢোকবার সময় আশপাশটা দেখে নেয়, পাছে কোন পরিচিত কেউ দেখল কিনা। তাহলে আর মুখ দেখাতে পারবে না। অর্ণবের পেছন পেছন এগিয়ে যায়। ডানদিকের কাউণ্টারে সারিসারি হরেক রকমের ঝকঝকে গ্লাস সাজানো, আর অনেক রকম লেবেল লাগানো বোতল। সামনে একটা বিলিয়ার্ড টেবিল। দুজন নিবিষ্ট মনে খেলছে। টেবিলের ধারে গ্লাস। ফাঁকে ফাঁকে একটু

একটু চুমুক দিচ্ছে। প্রবীর এক নজরে দেখে নিচ্ছে সবটুকু। হঠাৎ অর্ণবের খোঁচায় সজাগ হয়ে ওর নির্দ্দেশিত চেয়ারে দেখে এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। কোঁকড়ানো চুল, সমস্ত কাঁধটা অনাবৃত। ফিকে লাল রঙের আধখানা ব্লাউজটা যে গায়ে আছে মনেই হয় না। ঠিক সেই রঙেরই শাড়ী। অর্ণব মহিলার সামনে এগিয়ে যায়। প্রবীর পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকে।

—ঠিক সময়েই এসে গেছি কিন্তু। তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে আমার বন্ধু প্রবীর মুখার্জী। আর ইনি হলেন অপর্ণা চ্যাটার্জী।

পরিচয় কবার রীতি অনুযায়ীই অপর্ণা এবং প্রবীর উভয়েই হাতজোড় করে। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত্বঃ প্রবীরের মধ্যে একটা শিহরণ খেলে যায়। সে ভুলে যায় অর্ণব সামনে দাঁড়িয়ে। সে বুঝে উঠতে পারে না সামনের অত্যাধুনিক মেয়েটা অপর্ণা।

—বসুন দাঁড়িয়ে কেন? আপনি অর্ণবের বন্ধু কাজেই আমার অতিথি।

প্রবীর যেন নিজের উপর অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলো সামনে গ্লাসের ছোট ছোট বুদবুদের মতো, কে আগে আত্মপ্রকাশ করবে তার জন্য মারামারি সুরু করে দিয়েছে। সমস্ত শরীরে যেন কিসের এক খেলা। স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিতেও কেমন ভুলে গেছে ও। প্রবীরের অবস্থা দেখে অর্ণব খুশী হয়। কারণ অর্ণবই শুধু নার্ভাস হয় না। প্রবীরও নার্ভাস হয়।

—কি হল চুপ করে রইলেন যে? একটু থেমে বলে, অর্ণব তুমি ত হুইস্কি, ইনি? ইঙ্গিতে প্রবীরকে দেখায়। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রবীর বলে, এক গ্লাস জল।

—সে কি! এখানে জল খেতে এসেছেন? কথাটা হেসে বললেও ইঙ্গিতবহ, যা শুধু প্রবীরকেই স্পর্শ করে। আজকালকার ছেলেরা সব কেমন যেন হয়ে গেছে।

অর্ণব ওয়েটারকে ডাকে। অর্ডার দিতে গিয়ে অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কি নেবে ?

—আমার আছে, আর দরকার নেই। তোমরা খাও। তোমার বন্ধুর জন্যে অন্য কিছু বল। anything soft. প্রবীরের সব রক্তবিন্দু-গুলো একসঙ্গে লাফিয়ে উঠতে চাইছে। তবুও সংযত করে নিজেকে।

—ঠিক আছে আমার জন্যও বল। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ভালো নয়, অন্ততঃ এখানে যখন এসে গেছি। অর্ণব অর্ডার দেয় দুজনের জন্যে। ক্লান্ত চোখ তুলে অপর্ণা তাকায় প্রবীরের দিকে। প্রবীর তখন সিগারেট খাওয়ায় মন দিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে তিন জনেই চুপ হয়ে গেছে। প্রবীরই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে,

—হ্যাঁ রে তোর ড্রামার কথা কি যেন তখন বলছিলি ?

—ও আর বলার কি আছে। প্রসঙ্গটা এড়াতে চায় ও।

আবার সব চুপচাপ। অর্ণব কেমন অসহায় বোধ করে। প্রবীরকে নিয়ে এসেছে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে যেটা স্বচ্ছন্দ মেলামেশা থাকলেও অর্ণব বলতে পারছে না অপর্ণাকে। হয়তো এই হয়। 'আমি তোমায় ভালবাসি' এ কথাটা বলতেই বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। এ সময়টুকুতে অন্তত কয়েক লক্ষ আজেবাজে কথা হয়। অন্য যে কোন মেয়ে হলে হত। অপর্ণাকে যে বেশীক্ষণ বসিয়ে রাখা যায় না এটা প্রবীরকে এখানে বলাও চলে না। অথচ প্রবীর কেমন চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। অন্য জায়গায় হলে এতক্ষণ প্রবীরের মুখে খৈ ফুটতো। কিছু না বলার থাকলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক বক করতো। আর ঠিক জায়গায় এসে কেমন সাহসের বেলুন ফুটো হয়ে গেছে। ওয়েটার দুটো গ্লাস এনে অর্ণব আর প্রবীরের সামনে রাখে। সঙ্গে এক প্লেট করে স্যালাড। সোডা ওয়াটারের বোতল দুটোর মুখ খুলে দেয়। হঠাৎ অপর্ণা বলে—

—আপনার যখন অভ্যাস নেই তখন নাই বা খেলেন ওসব। ঘরে গেলে বকুনি খেতে হবে হয়তো।

প্রবীর তার কোন জবাব না দিয়ে গ্লাসে চুমুক দেয়। গলাটা যেন জ্বলে যায়। বেশ তেতো এবং বিস্বাদ। তবুও জেদ করে একটু একটু মুখে দেয়। অর্ণব হাসে। প্রবীর স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি যে অপর্ণা এখানে থাকতে পারে। আর কিনা অর্ণবের প্রতিক্ষায়! সব কিছুই যেখানে স্বাভাবিক অন্ততঃ, তাই ভাবতে চেষ্টা করে ইদানিং, সেখানে এটাকে অস্বাভাবিক মনে করলে বাস্তবকে পেছন ফিরে চলতে হয়। প্রফেসর চ্যাটার্জির মেয়ে মদ খায় এটাই বর্ত্তমান এবং স্বাভাবিক নিয়ম। কয়েকটা শশার টুকরো মুখে ফেলে অর্ণব বলে,

—জানো অপু, প্রবীর আমার খুব ছোটবেলার বন্ধু। দিল্লীতেই থাকে। এখানেই পড়তো। কি খেয়াল হল বাবুর কথা নেই বার্ত্তা নেই হুট করে পালিয়ে গেল।

—তাই নাকি, দিল্লীতে থাকেন? কতবার ভেবেছি দিল্লী যাবো। ইতিহাসের নিদর্শন গুলো ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করে।

—চলো না এবার পূজোয় ঘুরে আসি।

—আমার আপত্তি নেই। কি বলেন প্রবীরবাবু। থাকতে দেবেন তো?

—যাবার ইচ্ছা থাকলে আমার ভরষাতে নিশ্চয়ই পাড়ি জমাবেন না।

—জমাতেও ত পারি। মুচকী হেসে অর্ণবকে বলে, তোমার কি কথা ছিল বললে না তো? আমি কিন্তু একটু পরেই উঠবো।

—কথা ছিল তবে—, থাক—, পরেই বলবো। অর্ণব পরিস্থিতিটা বুঝে উঠতে পাবে না। আর প্রবীরের নিরস কাটা কাটা কথা গুলোও সহ্য করতে পারে না, তবুও শেষ চেষ্টা করার জন্য অর্ণব সিগারেট কিনতে বেরিয়ে যায়। বেরুবার মুখে প্রবীরকে বলে,

—বোস, সিগারেট নিয়ে আসি। একসঙ্গেই বেরুবো।

প্রবীর বোঝে অর্ণবের এটা একটা চাল। কারণ ওয়েটারকে দিয়েই সিগারেট আনাতে পারতো। তবে কি অর্ণব বুঝতে পেরেছে যে অপর্ণার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে? না ওর হয়ে ওকালতি করার জন্যে একলা রেখে গেল ওকে। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম্ করছে। ইচ্ছে করছে চোখ বুজে পড়ে থাকে। চোখটা টানছে ভেতর দিকে, আর বুকটা কেমন হালকা। প্রবীর গ্লাসের অবশিষ্টাংশ খেয়ে ফেলে। একটু বমি বমি ভাব। চেপে রাখে আপ্রাণ। অপর্ণার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,

—আপনার গ্লাসে এখনও অনেকটা পড়ে আছে—খেয়ে ফেলুন।

—তুমি বুঝি বাহাদুরী দেখাবার জন্যেই খেলে?

—হবে।

—তুমি বুঝি জানতে না যে অর্ণব আমাব সঙ্গে দেখা করবে?

—না। জানলে আসতাম না।

—কেন, আমি খারাপ বলে?

—তুমি ভালো কি খারাপ কোনটাই জানিনা বলে।

—আগে কিন্তু জানতে।

—তখন তুমি মদ খেতে না। তাছাড়া তখন যা জানতাম হয়তো তা ভুল—। যাক, সময় নষ্ট করে লাভ নেই অর্ণব আমাকে নিয়ে এসেছে ওর হয়ে কিছু বলবার জন্যে।

—জানি।

—জানো?

—হ্যাঁ। ও আমায় ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে চায়, এই তো?

—কি করে জানলে যে ও এ কথাই বলতে আমায় নিয়ে এসেছে? এক্ষেত্রে সাধারণতঃ অন্যের উপস্থিতিটাই অবাঞ্ছনীয়।

—থাক্, বলতে তুমি ভালোই পারো তা আমি জানি। ছেলেদের চোখ দেখলেই আমি চিনতে পারি। অনেকের সঙ্গেই ত মিশলাম।

নতুনত্ব পেলাম না কোথাও। সব যেন কেমন একঘেয়ে। মুখস্ত করা কথা বলে যায়, তারপর ভালোবাসার হাত বাড়ায় শরীরের ওপর। ওটি না হলে নাকি ভালোবাসার আবির্ভাব হয় না। ভাবছো ওসব কথা আমার মুখে মানায় না, তাই না?

—ওসবে আমার প্রয়োজন নেই।

—তোমরা মন্বন্তরের ক্ষিধে নিয়ে আমাদের কাছে আসবে, আর কিছু বলতে গেলেই শোনার আগ্রহ থাকে না।

—তোমায় দেখেও কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে যে ক্ষিধে বস্তুটা মেয়েদের নেই?

—থাকবে না কেন, ক্ষেত্র বিশেষে হয়তো বেশী। দেহের ক্ষিধে দেহ দিয়ে মেটালে, পরে ভালোবাসার কোটিং কেন!

—অর্ণব আমার ছেলেবেলার বন্ধু। খুব ভালো ছেলে, বিয়ে করলে সুখী হবে।

—এখন বিয়ে করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। পরে ভেবে দেখবো। তাছাড়া ছেলে হিসেবে তুমিও খারাপ ছিলে না। তোমার সে ইচ্ছেটাও ত তুমি প্রকাশ করেছিলে—।

—কবে তোমার সঙ্গে একটা ফান্ করেছিলাম, সেটাকে কি সিরিয়াস ভেবে নিয়েছ?

—কথাটা আমার।

—আমি যাচ্ছি। অর্ণবকে বলো পরে দেখা হবে।

—দেখা হলে তোমার বন্ধুকে নিশ্চয়ই সাবধান করে দেবে আমার মতো একটা বাজে প্রকৃতির মেয়ের সঙ্গে যাতে না মেশে। ওকি। এখনই যাবে? চার বছর পর দেখা। যেতে চাও যাও। আবার কবে দেখা করবে? কালকে। কেমন?

—না।

—কেন?

—প্রয়োজন নেই বলে।

—আমার যে প্রয়োজন আছে প্রবীর। বাবার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করবে? উনি ত তোমার কাছে কোন দোষ করেন নি। প্রবীর চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়ে। আপর্ণার দিকে না তাকিয়ে এবং কথার কোন জবাব না দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায়। অপর্ণা আবার ডাকে,

—এই শোন। প্রবীর ফিরে তাকায়।—একটু বিশ্রাম করে যাও। তোমার পা টলছে। এভাবে রাস্তায় বেরুনো ঠিক নয়।

প্রবীর থমকে দাঁড়ায়। মাথাটা কেমন হালকা হয়ে গেছে। পা টলছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে মাত্রা না হারায়। অর্ণব এসে হাজির হয়।

—কোথায় যাচ্ছিস? বোস, এক সঙ্গে যাবো।

—না রে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। কাল দেখা করিস—বলে প্রবীর বেসামাল পা দুটোকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রবীরের যাওয়া দেখে পেছন থেকে অপর্ণা বলে—তোমার বন্ধু নার্ভাস হয়ে পালালো। কথার সঙ্গে টুকরো হাসির আওয়াজ কানে এসে মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয় প্রবীরের। রাস্তায় নেমেই বুঝতে পারে গোলাপী জলের ক্রিয়া ভালো ভাবেই সুরু হয়েছে। জ্ঞান পুরোপুরি থাকলেও শরীরটা কেমন আড়ষ্ট। রাগ করে চলে না এলেই ভালো করতো। এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না। সামনে একটা রিক্সা দেখে উঠে পড়ে। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করতে চেষ্টা করে কটা বাজে। ছোট কাঁটাটা একবার নটার ঘরে একবার দশটার ঘরে নড়াচড়া করছে। রিক্সাওয়ালাকে ওর গন্তব্য বলে দেয়। জীবনের সমস্ত অর্থটাই কেমন বেসামাল হয়ে পড়ছে। অপর্ণাকে ও ভালোবাসে না এটাই তার মনকে বোঝাতে চেয়েছে এতদিন। আজ যখন ওকে অর্ণবের সঙ্গে দেখলো তখন কেন এরকম এক বিশ্রী যন্ত্রণা? হঠাৎ যেন মনে হয় ও ভীষণ একলা। কাউকে যেন ওর কাম্যভাবে প্রয়োজন। রিক্সার ছোট ছোট ঝাঁকানিতে ওর তন্দ্রা

এসে যায়। আপ্রাণ ভুলতে চাওয়া ঘটনাগুলো হয়তো তাই অমলিন ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এতদিন, যখনই কোথাও একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে, হয়তো যমুনার পাড়ে— যেখান থেকে তাজমহলকে দেখা যায়, নয়তো শাহাজাহানাবাদের বিরাট প্রাসাদগুলোর দেয়ালে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অব্যক্ত কান্নাগুলো কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করতো, ইচ্ছে করতো নিজেকে সেই অতীত ইতিহাসের পাতায় সংযোজিত করতে—তখন হাজার চেষ্টা করেও নিজের জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো স্পষ্ট মনে করতে পারেনি। আজ নেশা ধরা চোখে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ইতিহাসের দেয়ালগুলোতে নিজেকে আটকে রাখতে পারছে না। বার বার মনে ভেসে উঠছে স্পষ্ট ভাবে—ফেলে-আসা দিনগুলোর ছবি। অপর্ণার মুখটা ভেসে উঠছে, যে অপর্ণা আজকের নয়।

প্রবীর সবে প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হয়েছে। আনন্দে মনটা যেমন ভরে উঠেছে তেমনি খারাপও হয়েছে পুরনো বন্ধুদের ছেড়ে আসার জন্যে। স্কুল জীবনে এক নাগাড়ে দশটি বছর যাদের সঙ্গে পড়াশুনা করেছে, অনেকেই হয়তো পরীক্ষায় পাশ করেছে কিন্তু প্রবীরের সঙ্গে কেউ প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হয়নি। বড় বড় থাম আর বিরাট বাড়ীটার ফাঁকা ফাঁকা ক্লাসরুমগুলো প্রবীরের মনের নিঃসঙ্গতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সহপাঠী এবং সহপাঠিনী অনেকেই আছে। অথচ প্রবীর মনে করে তারা সবাই ওর চাইতে বড় এবং জ্ঞানও ওর চাইতে বেশী। তাই নিজের এই হীনমন্যতাকে ঢাকবার জন্য সবার কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে। দূর থেকে দেখে, দূর থেকে বোঝবার চেষ্টা করে অন্যদের। ছেলেরা কারণে অকারণে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, অপ্রয়োজনে হেসে গড়িয়ে পড়ে একে অন্যের ওপর। এরকম ভাবে কিছুদিন যাবার পর পরিচয় হয় পরিতোষ মুখার্জীর সঙ্গে। বয়সে প্রবীরের থেকে দু-এক বছরের বড়। কলেজে ঢুকেই ইউনিয়ান করায় মেতে উঠেছে। যদিও প্রেসিডেন্সির ইউনিয়ান অনেকটা সোনার পাথর বাটীর মত তবুও পরিতোষ তার ভেতর কিছু করার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যস্ত। সেই কারণেই প্রবীরের সঙ্গে পরিচয় ওর। প্রবীর ভালোবাসে পরিতোষকে ওর সহজ মেলামেশার জন্যে। কলেজের আরেক-জনকে প্রবীরের ভালো লাগত। কারণ সেও চেষ্টা করত একা থাকতে। যদিও সেটা হয়ে উঠতো না অনেক সময়। অপর্ণা চ্যাটার্জি কলেজের মধ্যে প্যারাগন অফ বিউটি না হলেও তার এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, চেহারায় এমন একটা আকর্ষণ ছিল, যা অন্যকে প্রভাবিত করত খুব অল্প সময়ে। দূর থেকে প্রবীর অপর্ণাকে দেখতো। কাছে এগিয়ে যাবার সাহস হত না। কলেজে আরও

মেয়ে ছিল যাদের মধ্যে সোনালীর নাম করা চলে। সোনালী সত্যিই সুন্দরী তবু তার মধ্যে অপর্ণা বিশিষ্ট, অপর্ণা শুধু অপর্ণাই।

প্রবীর দূর থেকে দেখত অপর্ণাকে। কখনো কখনো চোখাচোখি হয়ে গেলে লজ্জা পেতো তবুও আবার তাকাতো প্রফেসরের লেকচারের ফাঁকে ফাঁকে। লক্ষ্য করে দেখেছে পরিতোষের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আছে। কাজের কথার বাইরেও যে তারা অন্য কথা বলে এটা ক্লাসের অনেক ছেলের কাছেই প্রকাশ্য। মাঝে মাঝে ক্লাস শেষ হলে অথবা অফ পিরিয়ড থাকলে অনেকেই কফি হাউসে আড্ডা জমায়। প্রবীরও যায় না যে এমন নয়। তবে কফির পোড়া গন্ধটা ওর কেমন অসহ্য লাগে। এমনি—একদিন কি করবে না করবে ভাবতে ভাবতে কফি হাউসে যায়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে, পরিচিত কাউকে দেখতে পাওয়া যায় কি না। চোখ পড়ে দেওয়াল ঘেরা কোনের টেবিলটার দিকে। অপর্ণা বসে আছে একা। সামনে কফির কাপ। কোন একটা টেবিলে বসবার জন্যে প্রবীর এদিক ওদিক তাকায়। চোখাচোখি হয় আবার অপর্ণার সঙ্গে, দেখে হাতের ইসারায় ওকে ডাকছে। লজ্জা এবং সংকোচ 'এক সঙ্গে চেপে ধরে ওকে। কোন একটা চেয়ারে ধাক্কা খায়। একটা চেয়ারের হাতলে পাঞ্জাবীর পকেটটা আটকে হয়ত ছিঁড়ে যায়। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অপর্ণা বলে,—বসুন।

—প্রবীর একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলে,

—বন্ধু বান্ধবদের খুঁজছিলেন বুঝি ?

—না। সময় কাটাবার জন্য চলে এসেছি।

—কফি খাবেন নিশ্চয়ই ?

—না মানে আমিই বলছি। হাতের ইসারায় বেয়ারাকে ডেকে দু-কাপ কফির অর্ডার দেয় অপর্ণা।

—দু-কাপ কেন ?

—অনেকক্ষণ আগে খেয়েছি।

প্রবীর আর কোন কথা খুঁজে পায় না। উপলব্ধির দ্বারা বুঝতে পারে অপর্ণা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

—আপনি রোজ আসেন কফি হাউসে ?

—কেন বলুন তো ?

—মানে, শুনছিলাম এখানে আড্ডা দিলে নাকি ইনটেলেকচুয়াল হওয়া যায়।

—সেই জন্যেই আসেন বুঝি ?

—সেরকম হবার সাধ আমার মোটেই নেই। প্লিজ একটু ডান দিকে সরে বসুন তো।

—কেন ?

—আপনার জন্যে পাশের টেবিলের ঐ ইয়ার্কীমার্কা ছেলেটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পাবার জন্যে এমন আঁকপাক করছে যে দেখলে মায়া হয়।

প্রবীর বুঝে উঠতে পারে না সত্যিই সরবে কি সরবে না। এ আবার প্রবীরের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নয়তো ? ছেলেটা দেখবে তার জন্যে প্রবীরকে সরে বসতে হবে ? ইচ্ছে করছে আরও ভালো ভাবে আড়াল করে বসে, যাতে ছেলেটা অসভ্যের মতো অপর্ণার দিকে তাকাতে না পারে। কিন্তু অবাকও হয় অপর্ণার ব্যবহারে। দেখে ওই যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজেকে দেখাবার জন্য। বেসবাস একটু ঢিলে করে চেয়ারে আল্‌তো ভাবে কাত হয়ে রয়েছে। প্রবীরের নিজেরই লজ্জা করতে থাকে। রাগ হয় অপর্ণার ওপর। তাড়াতাড়ি করে কফিটা শেষ করে ফেলে। বেয়ারাকে ডাকে। পকেট থেকে টাকা বের করবার সময় বাধা পায় অপর্ণার কাছে।

—ওটা আমিই দেব। তাছাড়া এত তাড়া কিসের ? বসুন না আর একটু। একসঙ্গেই উঠবো। প্রবীর বসে পড়ে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। সদ্য সিগারেটে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। জোরে টান দিয়েই নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করে।

অপর্ণা মুচকী হাসে। প্রবীরের ইচ্ছে করে অপর্ণার সঙ্গে আলাপ জমায়। কিন্তু মনে মনে হাজার বার তৈরি হয়েও সহজ ভাবে কথা বলতে পারে না। মাথা নেই মুণ্ড নেই—এমন অনেক কথাই সিগারেট টানতে টানতে প্রবীর ভাবছে।

—কলেজের কার কার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল বলুন।

—এক পবিতোষ ছাড়া অন্য কোন ছেলের সঙ্গেই তেমন পরিচয় হয়নি।

—ওকে কেমন লাগে।

—ভালো।

—আমারও ভালো লাগে। ঐ দেখুন নাম করতে করতে এসে হাজির।

প্রবীর তাকিয়ে দেখে পরিতোষ ওদের টেবিলের দিকেই আসছে। পরণে ঢোলা পায়জামা আর গায়ে হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবী। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলে।

—এই যে তোমরা এখানে। তা প্রবীব; তোমাকে ত এদিকে দেখিনা!

—আমি, তবে খুব কম।

—তোমবা কফি খেয়েছ?

—হ্যাঁ তোমার জন্যে নিলেই হবে। অপর্ণাই জবাব দেয়।

কেমন এক অভিমান যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কার জন্যে এবং কেন তা হয়তো প্রবীর নিজেও বলতে পারবে না। কোন ভূমিকা না করেই প্রবীর উঠে দাঁড়ায়।

—আমি চলি। বুঝলেন?

পরিতোষ একটু হেসে মাথা নাড়ে। অপর্ণা একটু তাকায়। কোন কথা বলে না। প্রবীর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে যায় কফি হাউস থেকে। একটু আগে যে বসতে বলেছিল যাবার সময় সে কোন কথাই বললো না।

এর পর প্রবীর ক্লাসে গেছে অথচ কফি হাউসের সামান্য পরিচয়টাকে ঝালিয়ে নেবার আর চেষ্টাই করেনি। অবাধ্য চোখটা মাঝে মাঝে খুঁজে দেখ্‌তে চায় অপর্ণা নামের মেয়েটিকে। মন শাসন করে। এমনি করে এক বছর হয়ে এলো। জীবনের পরিধি বেড়ে গেলো অনেকটা। কলেজের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে প্রবীরের। বিশেষ করে সুরঞ্জনের সঙ্গে। কি জানি কেন ছেলেটিকে ওর ভালো লাগে। এরকম নিস্তরঙ্গ কলেজ জীবনে একটু যেন পরিবর্ত্তন এলো। প্রবীর একটু বিশিষ্ট হয়ে উঠলো। যুব উৎসবের জন্যে অনেক রকম প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা হয়েছিল। সুরঞ্জন সেই প্রতিযোগীতার জন্যেই একটা গল্প লিখে কফি হাউসে প্রবীরকে সেটা পড়ে শোনায় এবং অনুরোধ করে যাতে প্রবীরও একটা গল্প জমা দেয়। গল্প পড়ার নেশা থাকলেও প্রবীর কখনো গল্প লেখেনি। তাই সুরঞ্জনের কথা ও হেসেই উড়িয়ে দেয়। বাড়ী ফিরে বিছানায় শুয়ে ওর যেন বার বার মনে হতে থাকে, ইচ্ছা করলে ও-ও গল্প লিখতে পারে। শেষ পর্যন্ত রাত জেগে গল্প একটা লিখেও ফেলে। তার পরদিন সুরঞ্জনের মারফৎ গল্পটা জমা দেয়। প্রবীর কখনো কল্পনাও করেনি যে ওর গল্প প্রথম হবে। অপর্ণা এসে কনগ্রেচুলেশন জানিয়ে যায়। সোনালী এসে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রবীরের বয়স যেন হঠাৎ বেড়ে যায়। এমনি করে চললে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু পরিবর্ত্তন এলো অন্য দিকে এবং ব্যাপক ভাবে। সুরঞ্জন এবং পরিতোষ প্রবীরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। পরিতোষ আর অপর্ণা, সুরঞ্জন আর শীলা। সুরঞ্জনের সঙ্গে বেড়াতে বেরুলে শীলার সঙ্গে যত সহজ ভাবে মেলামেশা করতে পারে, পরিতোষের সঙ্গে বেড়াতে গেলে অপর্ণার সঙ্গে তেমন মিশতে পারে না। এমনি—একদিন পরিতোষ ক্লাসের শেষে প্রবীরকে বলে,

—মিনার্ভায় একটা পাশ পেয়েছি কালকের। কার্ডটা তোমার

কাছেই রাখো, অপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে যেও। আমার হয়তো একটু দেরি হতে পারে। তার পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রবীর অপর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে মিনার্ভার সামনে গিয়ে হাজির হয়। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দুজনে পরিতোষের জন্যে। এক সময় অপর্ণাই বলে,

—চলুন একটু চা খেয়েনি। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি তাই চা খাওয়া হয়নি।

দুজনে এক চায়ের দোকানে গিয়ে চা খায়। আবার এসে থিয়েটারের দরজার সামনে দাঁড়ায়। তবুও পরিতোষ আসে না। পরিতোষ না থাকার দরুণ প্রবীরও কেমন আড়ষ্ট। নাটক আরম্ভ হবার সময় পেরিয়ে গেছে। অবশেষে অপর্ণাই বলে,

—চলুন। গেটে বলে আমরা ভেতরে গিয়ে বসি। কতক্ষণ আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। লোকটার যদি একটুও কাণ্ডজ্ঞান থাকত। অগত্যা গেটম্যানকে বলে প্রবীর আর অপর্ণা ভেতরে ঢুকে পড়ে। বই আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্ধকারে কোন রকমে দোতলার পথে চলতে থাকে। পাশটা সম্ভবতঃ বক্সের। ওদের একটা ঘেরা দেওয়া ছোট্ট ঘর দেখিয়ে দেয় গেটম্যান। বক্সের চেহারা দেখে প্রবীরের মন বিষিয়ে ওঠে। কোন চেয়ার নেই ওতে। একটু উঁচু প্ল্যাটফর্মের মত জায়গা তাতে পাতলা গদি বেছানো। হলের দিকটায় একফুট উঁচু রেলিং। বাইরের দিকে মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে তবে ষ্টেজটা দেখা যায় তাও সম্পূর্ণ নয়। কিছুক্ষণ এভাবে ঘাড় কাত করে নাটক দেখতে দেখতে প্রবীরের মাথার যন্ত্রণা সুরু হয়। কাঠের পার্টিসানে হেলান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকে ও। কপালের দুপাশের রগ দু-আঙুলে চেপে ধরে। ভীষণ ইচ্ছে করে শুয়ে পড়তে। কিন্তু পারে না। যেহেতু অপর্ণা আছে। কখন হয়তো পরিতোষ এসে পড়বে। একটা অঙ্ক শেষ হবার পর অপর্ণা প্রবীরকে জিজ্ঞেস করে।

—কি হয়েছে?

—ও কিছু না। মাথাটা কেমন ধরে আছে। কি হল পরিতোষ আসছে না যে। আপনাকে কিছু বলেছে?

—তেমন কিছু বলেনি। তবে কোথায় যেন মিটিং আছে, একটু দেরি হতে পারে সে কারণে।

আবার আলো নিবে যায়। বই আরম্ভ হয়। অপর্ণা তেমনি ঘাড় কাত করে দেখে। প্রবীর চোখ বুঝে নিজের মাথা নিজেই টেপে।

—বেশী যন্ত্রণা হচ্ছে? প্রবীর কোন জবাব দেয় না।—মাথা টিপে দেবো? তারও কোন জবাব দেয় না ও। শুধু মাথাটাকে একটু কাত করে হেলান দিয়ে শোয়। অপর্ণা মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আবেশে চোখ বুজে আসে প্রবীরের। নিজেকে আরও বেশী আলগা করে দেয় অপর্ণার কাছে। অপর্ণাও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে মাথা নীচু করে প্রবীরকে জিজ্ঞেস করে —কেমন লাগছে? প্রবীর মাথা নেড়ে জানায় 'ভালো লাগছে'। আবার আলো জ্বলে ওঠে। প্রবীর বেরিয়ে যায় বাইরে। ভাঁড়ে করে দু-ভাঁড় চা নিয়ে আসে। অন্ধকারই ছিল ভালো। আলোয় যেন অপর্ণার মুখের দিকে তাকাতে পারে না লজ্জায়। এ লজ্জা কেন বা কিসের প্রবীব তা বলতে পারে না। অপর্ণা বলে যায় অনেক কথা। কেমন অভিনয় হচ্ছে, নাটকের গলদ কোথায় এমনি সব চুল চেরা বিচার। আলো নেভে। প্রবীর অপর্ণার হাতের পরশ পাবার জন্য এলিয়ে দেয় নিজেকে। এবার অপর্ণাই প্রবীরের মাথাটাকে কোলের ওপর টেনে নেয়। হাত বুলিয়ে দিতে থাকে মাথায়, কপালে, মুখে। প্রবীর অপর্ণার হাতটাকে ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে। অপর্ণা বাধা দেয় না। এবং ঝুঁকে পড়ে প্রবীরের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। ওর নিঃশ্বাস এসে পড়ে প্রবীরের মুখে। সমস্ত শরীরটা একটা ঝাকুনি দিয়ে কেঁপে ওঠে প্রবীরের। চোখ খুলতে সাহস পায় না পাছে সব কিছু হারিয়ে যায়। ওর সমগ্র আত্মা চাইছে আরও বেশী ঘনিষ্ট হতে।

এক সময় সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে সরিয়ে রেখে অপর্ণার মাথাটাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে প্রবীর। কোন বাধা পায় না অপর্ণার তরফ থেকে। ঠোঁট দুটো চেপে ধরে ওর ঠোঁটের ওপর। ওর সমগ্র সত্বাটাকে যেন মিশিয়ে দিতে চায় আর কারুর সত্বার সঙ্গে। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে ও বলতে পারে না। এক সময় আলো জ্বলে ওঠে। দুজন দুজনকে ছেড়ে সরে বসে। নাটক শেষ হয়েছে। কেউ কারুর সঙ্গে কথা না বলে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নেয়। রোগ সেরে ওঠার পর মানুষ যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, প্রবীরও ঠিক তেমনি দুর্বল অনুভব করছে। ট্যাক্সিতে ওঠার পর অপর্ণা শুধু একটা কথাই বলেছে—আমি একাই যেতে পারবো। গন্তব্য স্থলে আসার আগেই প্রবীর নেমে যায়। রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে প্রবীরের মনটা অনুশোচনায় ভরে যায়। পরিতোষের কথা বারবার মনে পড়ছে। অপর্ণা নিশ্চয়ই পরিতোষকে সব কথা বলবে।

তার পরদিন কলেজ যায়নি প্রবীর। দিদিকে বলেছে শরীর ভালো নেই। রেনু হেসেছে। শরীর খারাপ থাকলেও প্রবীর কখনো ক্লাস কামাই করে না। আজ দাদাকে যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখছে জ্বর নেই। তবে? একদিন এ ভাবে কাটিয়ে পরদিন প্রবীর কলেজ যায়। যেতে যেতে ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে। কোন দিকে না তাকিয়ে পেছন দিকে বসে পড়ে কৌতুহলি চোখ সুযোগ বুঝে দেখে নেয় কে কোথায় আছে। দেখে পরিতোষ নেই। প্রফেসরের পাশের বেঞ্চটার দিকে তাকাতেই দেখে অপর্ণা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লজ্জায় প্রবীর চোখ ফিরিয়ে নেয়। ক্লাস শেষ হয়—প্রবীরের অস্বস্তি বাড়তে থাকে। ক্লাস থেকে বেরোবে কি বেরোবে না ভাবছে এমন সময় অপর্ণা এসে ওর সামনে দাঁড়ায়। বই নাড়া চাড়া করতে করতে একটা কাগজ বই এর ভেতর রেখে চলে যায়। প্রবীর বই হাতে নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যায়।

কলেজ স্কোয়ারে ফাঁকা দেখে একটা বেঞ্চিতে বসে চিঠিটা বই থেকে বের করে। পড়বে এমন সময় এক ভদ্রলোক পাশে এসে বসেন। চিঠিটা পকেটে নিয়ে উঠে যায় সেখান থেকে। ওর যেন মনে হয় সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। একটু ফাঁক দেখে চিঠিটা পড়ে ফেলে এক নিঃশ্বাসে। "বিকেল পাঁচটায় হাইকোর্ট ট্রাম ডিপোতে দেখা করো।"

বিকেলে দেখা হতেই অপর্ণা বলেছিল, 'তুমি একটা গবেট।'

—কেন?

– এমনি বললাম।

ধীরে ধীরে দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ক্লাস থেকে দুজনেই বেরিয়ে পড়ে কোথাও না কোথাও। পরিতোষকে একটু যেন সমীহ করে চলতো। কিছুদিন পর প্রবীরের সেটুকু দুর্বলতাও কেটে যায় ওর সহজ মেলামেশার জন্যে। ইনটার মিডিয়েট পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে প্রবীর আর একবার চমক লাগিয়ে দেয় সবাইকে। অনেকেই ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। অপর্ণার জন্যে পারে না। প্রবীরের জন্যে অপর্ণার মাথাব্যথার অন্ত নেই। নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বাবার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে প্রবীরকে স্পেশাল কোচ করার জন্যে। অপর্ণা একদিন প্রবীরদের বাড়ী গিয়ে দিদির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছে। একদিনেই দিদিকে নিজের দলে টেনে এনে প্রবীরকে বকুনি খাইয়েছে। রেণুকে কাছে টেনেছে অনেক বেশী। প্রবীরের সামনে এখন একটিই চিন্তা। বি, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া। অপর্ণার জন্যে ওর কোন ভাবনা নেই।

এমনি সরল রোজকার জীবনে হঠাৎ এক পরিবর্ত্তনের সূচনা হল। প্রথম প্রথম প্রবীর এটাকে আমল দেয়নি। কলেজে এক নতুন প্রফেসর এসেছেন। ওরা প্রফেসর বোস বলেই জানে। সদ্য পাশ করা। সুন্দর দেখতে। সব চাইতে সুন্দর ভদ্রলোকের কথা

বলার ধরণ। প্রবীরেরও ভালো লাগত ভদ্রলোকের পড়ানো। তবু, তবু কেন যেন সহ্য করতে পারতো না ভদ্রলোককে। হয়তো অপর্ণার প্রতি ওর অত্যাধিক আগ্রহই এর কারণ। মনে হয় অপর্ণাও এর প্রশ্রয় দেয়। এমনিভাবে কেটে যায় আরও কিছুদিন। প্রবীরদের ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস আরম্ভ হয়। তখন থেকে প্রবীর বুঝতে আরম্ভ করে অপর্ণা যেন আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রফেসর বোসের সঙ্গে মেলামেশা প্রবীর যে পছন্দ করে না এটা আকারে ইঙ্গিতে অপর্ণাকে জানায়। অপর্ণা গ্রাহ্য করে না। একদিন সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করে প্রবীর,

—প্রফেসর বোসের সঙ্গে তোমার অত্যাধিক মেলামেশা আমার ভালো লাগে না।

—তোমার ভালো না লাগলে আমি কি করতে পারি? আমার ভালো লাগে তাই মিশি।

—তার মানে তুমি ওনাকে ভালোবাস?

—হয়তো তাই।

—বুঝলাম না। পরিষ্কার করে বলো।

—তোমার কি বলার আছে তাড়াতাড়ি বলো, আমার এক জায়গায় যেতে হবে।

—আচ্ছা অপর্ণা, তুমি আমায় ভালোবাসতে এদ্দিন ধরে তাই জানতাম। আজ থেকে জানবো তুমি আমায় ভালোবাসো না। পরীক্ষার পর আমরা বিয়ে করবো এটা তোমার বাবার সম্মতি পেয়েছে। আর আজ? আজ তাও তুমি অস্বীকার করবে?

—কবে একটা ফান্ করেছিলাম, সেটাকেই তুমি সিরিয়াস ভেবে নিয়েছ? সব চাইতে সোজা এবং সহজ কথাটা তোমায় বললে তুমি সহ্য করতে পারবে না, তাই বলিনি। আমি ভেবেছিলাম আমার ব্যবহারেই তুমি বুঝে নেবে।

—থাক্ আর বলতে হবে না।

—তবুও শোন। তোমায় যখন ভালোবেসেছিলাম তখন কোন কারণ ছিল না। আজ যদি ভালোবাসতে না পারি তার জন্যে কারণ দেখাতে হবে কেন? তার চাইতে জীবনটাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করো। আর কাউকে ভালোবাসতে পারো কিনা দেখো। কি হল চলে যাচ্ছো? রাগ করে?

ফোর্ট উইলিয়ামের ঢালু দেয়ালটা যেখানে গঙ্গার পাড়ে এসে শেষ হয়েছে। অর্ণব আর অপর্ণা সেখানে বসে আছে পাশাপাশি। অপর্ণার কোলে কতগুলি বাদাম। দুজনে মিলে খাচ্ছে।

—তোমার বন্ধুটি সেদিন ভয়েই পালিয়ে গেল। তুমিও যেমন তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে ওখানে।

—কি করে জানবো বল। দিল্লীতে থাকে আর ওতে যে অভ্যস্থ হয়নি কি করে বুঝবো? আর ভয়ে পালাবার কথা বলছো? সেদিন আমিও অবাক হয়েছি ওর ব্যবহারে। সাধারণতঃ মেয়েদের সঙ্গে ও ভীষণ ফ্রিলি মেলামেশা করতে পারে।

—মেলামশা করতে পারলে অমন নার্ভাস হয়?

—তবে সেদিন তোমাকেও খুব ফ্রি মনে হয় নি।

—যাক্‌গে। তোমার বন্ধু আমার সম্বন্ধে কি কি বদনাম করেছে বলো।

—বদনাম?

—হ্যাঁ।

—পরদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ভেবেছিলাম দেখা পাবো না। গিয়ে দেখি বাবু ঘরেই আছে। রাস্তায় বেরিয়েই জিজ্ঞেস করলাম তোমাকে কেমন লেগেছে। বললো, "তোর ভালো লাগলেই হল। আমার লাগা না লাগা নিয়ে কিছু এসে যাবে না।" ওকে মিথ্যে করে বললাম তুমি দেখা করতে বলেছো বলে। প্রথমে ও বিশ্বাসই করেনি। শেষে উপায় না দেখে বললো, কোন্ একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা।

—ওঃ! তোমার বন্ধুও তাহলে বসে নেই, আটকে আছে আরেক জনের কাছে। দেখেছ নাকি তাকে। কি নাম?

—দেখিনি, তবে নামটা জেনে নিয়েছি।

—কি?

—কি যেন—। ও মনে পড়েছে শীলা।

—শীলা ?

—চেনো নাকি।

—না। তা বললে না তো আমার সম্বন্ধে কি বলেছে।

—বলেছে, তোমায় সুখী করতে পারলে আমিও নাকি সুখী হতে পারবো।

—তার মানে তোমার বন্ধু আমার সম্বন্ধে অনেক দূর ভেবে বসে আছে। ওর সম্বন্ধে আমি তোমায় কিছু বলেছি কিনা জিজ্ঞেস করেনি,

—না।

বাদাম ভাঙার জন্য ব্যস্ত আঙ্গুল গুলো স্তব্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। অর্ণব অনেক কথাই বলে যায় ওর ছেলেবেলার বন্ধু প্রবীর সম্বন্ধে। এক সময় অর্ণবের মনে হল অপর্ণা যেন ওর কথা শুনছে না।

—কি হয়েছে ? চুপ করে আছ ?

—চল, ভালো লাগছে না। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা দরকার। বাবার শরীরটা ভালো নেই। অগত্যা অর্ণবকে উঠতে হয়।

প্রবীর আর শীলা মুখোমুখি বসে আছে কফি হাউসের একটা টেবিলে। প্রবীরের হাতের সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে প্রায় আঙ্গুলের কাছে এসে গেছে।

—দিল্লী থেকে না এলেই ভালো করতাম। কনট সার্কাসে বসে থেকে জীবনের মানে খুঁজে পেতাম। দিদি ভীষণ ভাবে চাপ দিচ্ছে বিয়ে করার জন্যে। দিদিই আমার সব। ভাবছি বিয়ে করবো।

—ভালোই ত।

—কিন্তু মেয়ে কই ?

—বাংলা দেশে মেয়ের অভাব ?

—আচ্ছা শীলা, তোমায় যদি বিয়ে করতে চাই।

—ঠাট্টা করছেন প্রবীর দা ?

—না। আজ কয়েকদিন ধরে ভীষণ ইচ্ছে করছে কাউকে কাছে পেতে।

—অপর্ণার ওপর প্রতিশোধ ?

—কি জানি হয়তো তাই। তুমি ত সব কিছুই জানো।

—সব কিছু জানি বলেই আপনার কথাটা খুব সহজ ভাবে মানতে পারছি না। যাকগে, কাল দেখা করবো। আপনার বন্ধুরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। শীলা চলে যায়। প্রবীর ওখান থেকে উঠে অন্য টেবিলে যেখানে সুরঞ্জন বসে আছে সেখানে যায়। সুরঞ্জন চেয়ার এগিয়ে দেয় প্রবীরের জন্যে। টেবিলের একজন, হয়তো সুরঞ্জনের কোন বন্ধু, একটা দেশলাই নিয়ে খেলছে। সুরঞ্জন গ্লাসের জলে কফি ঢেলে একটা বিশেষ রং তৈরির কাজে ব্যস্ত। অন্য আরেক জন একটা ম্যাগাজিনে চোখ বোলাচ্ছে। .

—কফি চলবে ?—প্রবীর বলে।

—আপত্তি নেই। ভালোকথা, পত্রিকাটা এনেছি। ব্যাগ খুলে সুরঞ্জন কাগজটা দেয় প্রবীর পাতা উল্টে নিজের গল্পটা বের করে। পরিষ্কার হয়ে যায় কে ওর গল্প পাঠিয়েছে। কেমন বিস্বাদ হয়ে যায় মনটা। সেই অপর্ণা যাকে জীবনের প্রত্যেকটা দিক থেকে বাদ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এ এক বীভৎস জ্বালা। কলকাতায় সত্যিই আর থাকা চলে না। চলতে ফিরতে প্রতি মুহূর্তে সেই অপর্ণার ছায়া যে প্রবীরের সহজ সরল জীবনটাকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছে। দিল্লীই ভালো। সেখানে অন্তত অপর্ণার কথা বলে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না।

—কি ভাবছো ?

—ভাবছি দিল্লী চলে যাবে।

—কেন ?

—ভেবেছিলাম তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কিছুদিন কাটাবো

যাতে আর ক'বছর চাকরি করতে পারি, এসে দেখলাম সব পাল্টে গেছে ভীষণ ভাবে।

—খুব সম্ভব।

—তুমি তার এক মস্ত উদাহরণ।

—হবে। অপর্ণার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—হ্যাঁ। —প্রবীর সুরঞ্জনের মুখটা ভালো করে দেখবার চেষ্টা করে।

—ও ভীষণ বদলে গেছে। আগে কফি হাউসে আসতো। অনেকদিন আসে না। আগের সেই উজ্জলতা নেই। কেমন যেন শান্ত, গম্ভীর। প্রবীর বাধা দেয় না সুরঞ্জনের উচ্ছ্বাসকে। —যদিও ওর সঙ্গে আমার মেলামেশা এখন নেই তবুও এটুকু বলব—। একটু থামে।

—বল।

—তোমায় যখন অনেকদিন পর দেখলাম, মনটা খুশী হয়ে উঠেছিল। পরক্ষণেই মনটা খারপ হয়ে গেছে। অপর্ণার সঙ্গে আমার মেলামেশার খবর তুমি নিশ্চয়ই শীলার কাছ থেকে জেনেছ। কি জানি কেন আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ এসেছে। প্রথম থেকেই অপর্ণার প্রতি আমি একটা আকর্ষণ অনুভব করি। সেটাকে কাজে লাগাই তোমার চলে যাবার পর। হঠাৎ তোমার চলে যাওয়াটা আমিও ঠিক মেনে নিতে পারিনি। কেমন যেন নাটকীয়তা ছিল তাতে। কয়েক দিন পর অপুর মুখেই শুনি তুমি নাকি বাড়ীতে কিছু না বলেই চলে গেছ। আরও পরে জেনেছি প্রফেসর বোসের প্রতি অপুর অত্যাধিক আগ্রহই নাকি তার মূলে। আমার তাতে লাভ বই ক্ষতি ছিল না। কি বল ? প্রবীর সিগারেট ধরায়। বেয়ারাকে ইসারা করে কফি দিয়ে যাবার জন্যে। সুরঞ্জন ভাবতে থাকে তার পরবর্ত্তি কিছু।

জীবনের গভীরতা কতটুকু, প্রবীর তা বোঝেনা। বোঝেনা

অনেক কিছুই। কেন সে অপর্ণাকে ত্যাগ করলো আর সেটা প্রচার করার জন্য পালিয়ে গেলো কেন—আজ তার কোন কারণ খুঁজে পায় না। বিশেষ কোন একটা মেয়েকে পেলো না বলে জীবনের সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে, এর কারণ কি? এটা কি নিছক ভালোবাসা? জীবনটাও যখন উপন্যাসের পরিধির মধ্যে এসে অবসর মুহূর্তগুলি ভরিয়ে রাখতে চায়, তখন ঘটনা গুলো এমন খাপছাড়াই বা হয়ে যায় কেন, আর কেনই বা মনে হয় তাল কেটে যাচ্ছে—গল্প জমছে না। বন্ধু বান্ধবদের অনেকেরই ধারণা ছিল ও ভালো লিখতে পারে। ওর নিজেরও বিশ্বাস ছিল তাতে। কিন্তু আজ যেন ভাবতে বাধ্য হচ্ছে, জীবনের বৃহত্তর উপন্যাসকে হয়.তো স্রেফ নিরস ভাবে বিবৃত করা যায়, নয়তো কিছুই করা যায় না, এক স্মৃতির রোমন্থন করা ছাড়া। অনেক প্লটই ভাবে। লিখতে লিখতে যখন নিজের চেনা মুখ গুলো ভীড় করে দাঁড়ায় তখন সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

সুরঞ্জন বলে যায় তার কথা—অপর্ণার জীবনে 'হঠাৎ' জিনিষটার বড় প্রাবল্য। হঠাতই দেখি প্রফেসর বোসের প্রতি ওর অনাস্থা। প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে মেলামেশা করার সময় বেশীর ভাগ ছিল তোমাকে নিয়ে আলোচনা। অবশ্য ও কাজটা আমিই করতাম। আস্তে আস্তে আমিই বাদ দিলাম তোমার সম্বন্ধে আলোচনা। তখন সুরু হল কাগজ আর অপর্ণা। বুঝলাম মেয়েটা আমাকে চায়। ও আমাকে ভালবাসুক বা আমি ওকে ভালবাসি এরকম চিন্তাই আমরা করতাম না। প্রাপ্ত বয়স্ক ভাষায় বলতে গেলে—।

—থাক—

—না, শোন। ঘটনা যখন সত্য তখন লজ্জা পেয়ে কি লাভ। আমি মনে করতাম অপর্ণার দৈহিক চাহিদাই আছে অন্য কিছু নেই। তাই ও কাউকে ভালোবাসতে পারে না। প্রবীরের

সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে যায়। মনে পড়ে যায় সেই মিনার্ভা থিয়েটারের দিনটা।

—কিছুদিন বেশ ঘুরে বেড়ালাম। অনেক দূর এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা আমার এগিয়ে যাওয়াটা অর্ধেকেই থেমে গেল। যখনই ওকে আমার খুব কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি, তখনই দেখেছি ভারি সুন্দর উপায়ে এড়িয়ে গেছে আমাকে। তবু আমি আশা ছাড়ি না। তোমার কি মাথা ধরেছে প্রবীর? কথা দিচ্ছি একটা স্যারিডন খাওয়াবো। ওর এই এগিয়ে চলাটা আমার মনে হয়েছিল যে ও আরেকটু ঘনিষ্ঠতার অপেক্ষা রাখে। আমার সে মোহও ভেঙ্গে গেল। আমাদের কাগজের একটা কি দুটো সংখ্যা বেরিয়েছে। একদিন ও একটা গল্প আমার হাতে এনে দেয়। বলে, ভালো হলে যেন ছাপিয়ে দিই! কথা দিতে দেরি করিনি। কারণ ও তখন আমায় যা-ই ছাপাতে বলুক না কেন আমি হয়তো তাই ছাপতাম। কৌতূহল থাকলেও পাবলিক রেষ্টুরেন্টের ভাঁড়া করা সময়টুকু নষ্ট করতে চাইনি। তাই ওটা না দেখেই ব্যাগে রেখে দিই। বাড়ী গিয়ে খুলেই চমকে উঠি। দেখলাম তোমার গল্প। কেমন যেন একটা আঘাত পেলাম। মনে নেই সেই মুহূর্তে তোমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম কিনা। আর সঙ্গে সঙ্গে এই কথা ভাবলাম যে, ওর দেহের প্রতি আমার যত আকর্ষণই থাক, ওকে কিছুটা যেন ভালোবাসি।

বেয়ারা কখন এসে কফি দিয়ে গিয়েছিল কে জানে প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। প্রবীর এক চুমুকেই সবটা শেষ করে দেয়।

একটা সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে সুরঞ্জন বলে,—অনেকদিন বাঁচবে,—নাম নিতে নিতেই এসে পড়েছ।

চমকে পেছন ফিরে প্রবীর দেখে অপর্ণা ওদের টেবিলের দিকেই আসছে। প্রবীর আশা করেনি ওকে। তাছাড়া কফি হাউসে এলেও প্রবীরের সামনে আসবে এটা আশা করেনি। অপর্ণা দ্বিধাহীন

ভাবে ওদের টেবিলের সামনে এসে এক পলক ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে একটা খালি চেয়ার টেনে এনে বসে পড়ে। ভদ্রতার খাতিরেই প্রবীর এক নজর দেখে নেয় অপর্ণাকে।

—ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। কফি খাওয়াবে প্রবীর?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় প্রবীর।

—খুব অবাক হয়ে গেছ না আমাকে দেখে?

—না, আশে পাশের টেবিলের লোকগুলোই বরং একটু অবাক হয়েছে আমাদের টেবিলে তোমাকে দেখে।

—তাই নাকি?

মাথা ঘুরিয়ে একবার চারপাশটা দেখে নেয় অপর্ণা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এখন আর কফি-হাউসে আসতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টা যেন মাছি ভন ভন করছে। হয়তো বলবে এলে কেন। এসেছি তোমার খোঁজে। কি ব্যাপার তোমরা কোন কথা বলবে না বলে ঠিক করেছ? প্রবীর তোমার এখন কোন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে?

—না, কেন? আমার একটু দরকার ছিল। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে, আর আধঘণ্টা পরে যাব। পাশের টেবিলের দু তিনটে ছেলে অপর্ণার একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রবীরের দৃষ্টি সেদিকে পড়েছে। সে সম্বন্ধে আজকে যেন অপর্ণাকে আর কিছু বলা যায় না। আগে হলে বলতো ঠিক হয়ে বসতে। বলতে না পারার কারণই হোক বা ছেলেগুলোর আদেখলেপনার জন্যেই হোক প্রবীর এবং সুরঞ্জন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু কেন? অন্যের টেবিলের দিকে ওরাও ত একদিন এমনি ভাবে তাকিয়েছে, দুয়েকটা উক্তিও করেছে।

তবে? তাহলে ওকি এখনও অপর্ণাকে নিজের বলে ভাবে। ওদের অস্বস্তি অপর্ণা হয়তো বুঝেছে তাই আচলটা গায়ে জড়িয়ে নেয়। চুপ করে থাকলে কেমন বেমানান ঠেকে তাই প্রবীর জিজ্ঞেস করে,

—মাষ্টার মশাই কেমন আছেন ?

—একই রকম।

তারপর আর কথা খুঁজে পায় না।

—তুমি কিছু করছো নাকি ? কোন কাজকর্ম ?

—না, ভাবছি। ভাবছি, একটা মাষ্টারি টাষ্টারি নিয়ে কোথাও চলে যাবো। জানাশোনা থাকলে একটা ব্যবস্থা করে দাওনা। কদ্দিন আর বাবার বোঝা হয়ে থাকবো। অফিসের চাকরি দু'য়েকটার অফার পেয়েছিলাম। অফিসের নাম শুনলেই আমার গা ঘিন ঘিন করতে থাকে। চল উঠি।

প্রবীর কফির কাপটার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে শেষ করার জন্যে।

—এক গামলা কফি খাওয়া যায় নাকি !

প্রবীর সুরঞ্জনের দিকে তাকায়। ও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। ওরা বেরিয়ে যায় কফি হাউস থেকে।

এমন ভাবে অপর্ণার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে কিছুক্ষণ আগেও একথা প্রবীর ভাবেনি। চার বছর ধরে যাকে ভোলার চেষ্টা করেছে আপ্রাণ, ঘৃনায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আজ তার এক কথাতেই টেবিল ছেড়ে উঠে এলো। অপর্ণার সামনে যে এত দুবল হয়ে পড়ে এ কথা অন্য কেউ না জানলেও প্রবীর জানে। আর জানে বলেই ও পালিয়েছিল কলকাতা থেকে। দিল্লী যাওয়ার কিছুদিন পর যখন সব কিছু সয়ে এসেছে বলে ওর ধারণা তখন কোন নেমতন্ন বাড়ীতে অথবা কোন উৎসবে চোখ দুটো আপনা থেকেই কাকে খুঁজে বেড়াতো। সে জানে কাকে। অনেকের ভীড়ে দুজনের চিনতে পারার নীরব স্বীকৃতি খুঁজে বেড়িয়েছে—পায়নি। আজ নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জিত মনে হয়ে ওকে। অপর্ণার কাছে নিজের এই হীনমন্যতা নিশ্চয়ই অপ্রকাশিত নয়। ভেতরে ভেতরে রেগে ওঠে এক অকারণ আক্রোশে, এভাবে চলে আসার জন্যে

নিজের স্বপক্ষে যুক্তি খোঁজে। অপর্ণা বলে,

—তুমি নিশ্চয় রাগ করেছ আমার উপর এভাবে ডেকে নিয়ে আসার দরুণ। কিন্তু অন্য কোন উপায় ছিল না। আর বিশ্বাস করতে পারো আমার জন্যে তোমায় ডাকিনি। চল পুরনো জায়গায় গিয়ে বসি, বেশীক্ষণ আটকে রাখবো না। প্রবীর ওর পেছনে পেছনে চলতে থাকে কোন জবাব না দিয়ে। প্রবীরের যেন ইচ্ছা করে চীৎকার করে উঠে চুরমার করে দিতে অপর্ণার অস্তিত্বকে। রাস্তায় অনেক লোকজন থাকায় সে ইচ্ছা দমন করে। পৃথিবীতে ভদ্র হওয়া এক মস্ত বিড়ম্বনা—এটা প্রবীর বুঝে এসেছে অনেকদিন আগে থেকেই। কেউ তাকে শেখায়নি। এ যেন তার জন্মসূত্রে পাওয়া। ওর ছোটবোন বেণুও ঠিক তেমনি।

অনেক দিনের পরিচিত রেষ্টুরেন্টেই অপর্ণা ঢোকে। প্রবীর ওর পেছন পেছন মাথা তুলে চারপাশটা দেখবার ইচ্ছাটা মুলতুবি রাখে, কোন পরিচিতের চোখাচোখি হয়ে যাবার ভয়ে। ভয়টা কিসের ও জানে না। পরিচিত বয়ই হবে—অপর্ণাকে সেলাম করে কেবিনের পর্দা এক পাশে সরিয়ে দেয়।

—কি খাবে প্রবীর ?

—কিছু না।

—এটা তোমার রাগের কথা। খেতে ইচ্ছে না করলেও যে এখানে কিছু খেতে হয় এটা নিশ্চয়ই তুমি জানো। বল কি খাবে ?

—তোমার যা খুশী বলতে পারো।

একটু হেসে তাতেই সম্মতি দেয়। অপর্ণা পর্দা সরিয়ে বয়কে কি যেন অর্ডার দেয়। প্রবীর ততক্ষণে একটা সিগারেট ধরিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে। অপর্ণা যেন কি ভাবছে। অন্য মনস্ক ভাবে কপালের বাঁ পাশের এক গোছা কোঁকড়ানো চুলকে কানের উপর গুজে দেবার অকারণ চেষ্টা করছে। প্রবীর জানে ওর ওই অবাধ্য চুলগুলো কখনো বশে আনা যায় না। খুব আস্তে আস্তে অপর্ণা বলে,

—আজ তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। এমনি, কোন কারণ ছিল না। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে হয়তো রেণুও এসেছে। সেই আশায় গিয়েছিলাম। অনেক দিন ওকে দেখিনি। ওর বড় বড় চোখ গুলো এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তোমাদের বাড়ীর সদর দরজাটা পেরতে গিয়ে ভয়ে বুকটা ছুরছুর করছিল। ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেছি। দিদি অমিতকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখে দুজনেই উঠে বসে। ভেবেছিলাম সরাসরি প্রশ্ন করবেন কেন এসেছি। তা না, হাত ধরে পাশে বসিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন বাবা কেমন আছে, আমি কি করি, এতদিন আসিনি কেন।

—আমায় কি জন্যে ডেকেছ? এসব শোনাতে নিশ্চয়ই নয়?

—তুমি দিল্লীতে কি দুবেলাই রুটি খাও?

—কেন?

—না এমনি বলছিলাম। কথাগুলো কাটখোট্টা হয়ে গেছে কি না। যাক্, আমার যেটা বলবার, তার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক আছে তাই বলছিলাম।

বয় খাবার দিয়ে যায়। অপর্ণা প্রবীরের প্লেটের উপর মশলা ছড়িয়ে দিতে দিতে আড়চোখে প্রবীরকে পর্য বক্ষণ করে।

—তোমার যখন ভূমিকা শুনতে আপত্তি, অবশ্য আপত্তি কেন বুঝতে পারছি। তুমি ভাবছো তোমার দিদিকে আমার দলে টানছি। তা নয় আমি জানতাম না সকাল সকাল তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে। সেদিন একটু খানির জন্যে দেখা হওয়ার পর আর তোমার পাত্তাই পাইনি। ভাবলাম কখন ছুট করে চলে যাবে। আরেকবার দেখা করে নিই। তাছাড়া বাবাও বলছিলেন তোমায় খবর দেবার জন্যে। গেলাম যখন তখন কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

যখন ওখান থেকে বেরুলাম তখন কাঁধে একটা বোঝা নিয়ে। সরাসরিই বলে ফেলি। দিদি তোমার বিয়ের কথা বলছিলেন।

কেন যে আমাকেই বলতে গেলেন বুঝলাম না। উপেক্ষা করবো তেমন সাধ্যও যে নেই। কাল শীলার মা তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করেছেন। তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

—আমায় কিছু বলেনি।

—কেন শীলা কিছু বলেনি ?

—তার মানে ?

—মানে কিছুই নেই। কিছুক্ষণ আগেও শীলার সঙ্গে গল্প করেছ। কয়েকদিন বেড়াতে গেছ। তাছাড়া আগের পরিচয়টাও নিশ্চয়ই অগভীর নয়। তাই দিদি তোমায় জিজ্ঞেস করতে বলেছেন তুমি রাজী আছ কিনা। দিদিই তোমার একমাত্র অভিভাবক। তাই ওঁর চিন্তাটা স্বাভাবিক।

—আর কিছু বলবে ?

—তোমার কনসেন্ট পেলেই আমি জানিয়ে দেবো। ঘটকের কাজ করার এক অদম্য ইচ্ছা জেগেছে। কাজ ত কখনও করিনি, এবার—।

—থামো। কিছু জানাবার হয় আমি জানাবো। এ নিয়ে তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। শীলার সঙ্গে আমার এমন কোন সম্পর্ক নেই যাতে তাকে বিয়ে করার প্রশ্ন আসে।

—ইদানিং মেলামেশা করছ ত খুব।

—মেলামেশা করলেই কি প্রেম হয়েছে মনে করতে হবে ? আর তার জন্য বিয়ে ! মেলামেশা করলেই তবে প্রেম হয়—কি বলো ? এ জন্যেই কি ডেকে এনেছ ?

—খানিকটা, তবে সবটা না। সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে একটা কেমন যেন বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সিভালরি দেখাবার জন্যে ঢক ঢক করে গিললে। তাই আর কখনো যেন ওপথে না যাও তাই বলতে ডেকেছি। তাছাড়া তোমার সঙ্গে একবার দেখা করার

লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার আন্তরিক অনুরোধ আমার জন্যে তোমার নিজেব সর্বনাশ করো না।

অনেক কিছু বলবার মত কথাগুলো যেন হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল। হয়তো দুজনেব মনেব তন্ত্রীতে তখন এক সুব ছিল। কোথায় যেন দুর্বল সুরের সংপর্শে এসে উভয়েই স্তব্ধ হয়ে গেছে. স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নেবাব ব্যাঘাত ঘটলেই কি দীর্ঘশ্বাস হয়! তাইই হবে, প্রবীরের দীর্ঘশ্বাসে অপর্ণা চমকে ওঠে। কেমন একটা থমথমে পরিবেশ, মনে হচ্ছে সময স্তব্ধ। অপর্ণা চাইছে দুহাত দিয়ে সবিয়ে দিতে এই পাথবের মতো চাপ চাপ অবস্থাটাকে।

—রেণুকে নিয়ে এলে না কেন? ও আমায় ভীষণ ভালোবাসে। আনলে না কেন?

—ও কাশ্মীর বেড়াতে গেছে মামাব সঙ্গে।

—তুমি গেলে না কেন?

—দিদি এখানে না থাকলে হয়তো আসতাম না। ভাবছি দিদিকে সেখানেই নিয়ে যাবো।

—সেই ভালো।. তাই নিয়ে যাও। আব কিছু না হোক তুমি ত রক্ষা পাবে।

সেদিন বারে দেখা অপর্ণাব ছবিটাই যেন ভেসে উঠছে। আগে, কথা বলাব আগে ওর চোখে' কোন দুটো হেসে উঠতো। এখন যেন কোথায় হাবিয়ে গেছে সে গোপন হাসিটি। দেখলে মনে হয় যেন ও এখন পুবোপুবি প্র্যাক্‌টিক্যাল। প্রবীবেব ইচ্ছে করে ওর কপালে এসে পড়া অবাধ্য চুলগুলো আলগোছে সবিয়ে দেয়। কেমন এক বিশ্রী যন্ত্রণা ওব হাতটাকে আটকে রাখে। কতজনের হাত পড়েছে এমনি? প্রবীর সিগারেট বের করে। হাত থেকে দেশলাইটা কেড়ে নেয় অপর্ণা। ও-ই সিগারেটটা জ্বালিয়ে দেয় প্রবীরের।

—আমার ভীষণ ভালো লাগে এমনি সিগারেট জ্বালিয়ে দিতে।

মুখ থেকে সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দেবার আপ্রাণ ইচ্ছাটা দমন করে, অভদ্রতা হবে তাই। তাছাড়া প্রবীর সরাসরি কাউকে অপমান করতে চায় না।

আগ্রার ঐতিহাসিক প্রাচীরগুলো দেখতে দেখতে মনে মনে যাকে সব সময় পাশে কল্পনা করে, যার জন্যে অন্য মেয়েদের দিকে তাকাবার প্রয়োজন মনে করে না—আজ যখন তাকে কাছে পেয়েছে কিছুই যেন বলতে পারছে না। কোথায় যেন একটা বিবাট বাধা। অথচ সেটা কি প্রবীর জানে না। মনে হচ্ছে গলা দিয়ে কি একটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে অথচ আটকে রয়েছে গলারই কোন যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ। দিল্লীতে বসে যখন কলকাতার দুতিন বছরের কথা ভেবেছে তখনই নিজেকে বড় ছেলেমানুষ মনে হয়েছে। ভীষণ ইচ্ছে করছে অপর্ণাকে জিজ্ঞেস করতে, প্রবীরকে ছাড়া অন্য যাদের সঙ্গে অপর্ণা মেলামেশা করেছে তাতে সত্যি ছিল কিনা। মন চাইলে কি হবে, পরক্ষণেই আহত প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে বলে ওঠে—সেটাই সত্যি, অপর্ণার কাছে ক্রমপরিবর্ত্তনশীল দেহটাই সত্যি আর সব মিথ্যে। মিথ্যে প্রবীরের ভালোবাসা।

অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হয়েছে আরও কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকলে যেন ভালো হয়। দিদি চা খাবার জন্যে বার দুয়েক ডেকে চুপ করে গেছে। বাইরের আলো এড়াতে চোখে একটা হাত চাপা দিয়ে রেখেছে প্রবীর। মনে পড়ে যায় কাল রাতে যেন ভালো ঘুম হয় নি। এখন মনে করার চেষ্টা করে ঘুমহীন অবস্থায় সে কি করেছিল। শুধু মনে হয় ঘুম হয়নি, আর বেশী কিছু মনে পড়ে না। মস্তিষ্কের শিথিল কোষগুলি আবছাভাবে মনে করিয়ে দেয় কালকের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো।…শীলা।… কফিহাউস।…সুরঞ্জন।…অপর্ণা।…রেষ্টুরেন্ট।

কালকের বিক্ষিপ্ত মনটা আজ অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। মনে হয় এক রাতেই যেন জীবনের অনেকটুকু পথ পেরিয়ে এসেছে ও। অপর্ণাকে সে ভুলতে হয়তো পারতো যদি সেটা সুখের হত। একটা গভীর ক্ষত সময়ের প্রলেপে হয়তো শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু তবুও তার চিহ্ন রয়ে গেছে। অসাবধান হলে হয়তো আবার তাতে আঘাত লেগে যন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় শীলা সম্বন্ধে অপর্ণার কথাগুলো। শীলার মা এসেছিলেন দিদির কাছে। শীলাদের এ ধরণের ব্যবহারের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় আগুন ধরে যায়। আর দিদির কি এতটুকু বুদ্ধিও নেই? প্রবীরকে বলবার জন্যে অপর্ণাকে অনুরোধ করতে, গেলেন। সরাসরি প্রবীরকে সেকথা জিজ্ঞেস করলে কি অসুবিধা ছিল? সমস্ত ঝালটা গিয়ে দিদির ওপর পড়ে। বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। দাঁত মাজতে মাজতে কলতলায় গিয়ে হাজির হয়। প্রবীরকে দেখে কলতলার জায়গা ছেড়ে দেয় কেউ। প্রবীর কারুর দিকে তাকায় না। ওর মনে হয় সবাই প্রবীরের বিয়ের ব্যাপারটা জানে, তাই ওকে পর্যবেক্ষণ করছে। খুব ভালো করে চোখে মুখে জল দিতেই রাগটা অনেক খানি কমে আসে। রান্নাঘরে দেখে দিদি ডাল ঘুটছে। প্রবীর একটা পিড়ি নিয়ে দিদির পাশে বসে।

—একটা পেঁয়াজ আর কটা লঙ্কা কুটে দে ত, আমি তোর চা তৈরী করে দিচ্ছি।

প্রবীর কোন জবাব না দিয়ে ঝুড়ি থেকে পেঁয়াজ লঙ্কা বের করে কুটতে বসে। এতক্ষণ ও ঠিক করে রেখেছিল কালকের ব্যাপার নিয়ে দিদিকে সরাসরি অভিযুক্ত করবে। এখন সে রাগটুকু যেন নেই। প্রতীক্ষা করে দিদি কখন নিজে থেকেই সে কথাটা উত্থাপন করে। ডালটা ঘোটা শেষ হলে অল্প জল ঢেলে হাত মুছতে মুছতে দিদি বলে,

—কাল অপু এসেছিল। প্রবীর কোন জবাব দেয় না কথার।

—অনেক দিন পরে এলো। তোর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল। তা তোর ত ঘরে থাকতে মন চায় না। কোথায় যে টৈ টৈ করে ঘুরে বেড়াস ভগবান জানেন।

প্রবীরের মুখের দিকে দিদি তাকায়। প্রবীর একটা পেঁয়াজকে অনেক্ষণ ধরে কাটে।

মেয়েটা অনেক রোগা হয়ে গেছে।

ডালটা নামিয়ে উনুনে কেটলিটা চাপিয়ে দেয়। বাটিতে ঢাকা দেওয়া সুজি প্রবীরের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে,

—তুই কি শীলাকে কোন কথা দিয়েছিস?

—কিসের?

—কেন, বিয়ের? শীলার মা এসেছিলেন। তোর সঙ্গেই ত পড়ত নারে? তোরা বড় হয়েছিস। তোরা নিজেরাই নিজেদেরটা ঠিক করে নিলে কাজ অনেক সোজা হয়ে যায়। তাছাড়া বিয়ের বয়স ত তোর হয়েছে। তোর জামাইবাবুকে বলেছিলাম। ও তো শুনে লাফাতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

—শীলার মা কি তোমায় বলেছে যে আমি শীলাকে কথা দিয়েছি?

—তা না, ওটা আমার অনুমান। তাছাড়া অপু বলছিল তোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে, আর মেয়ে হিসেবে শীলাও খুব খারাপ নয়।

—থামো ত। মেলামেশা আমি অনেকের সঙ্গেই করি। তাছাড়া সে মেলামেশার জন্যে কাউকে বিয়ে করতে হবে এমন কোন কারণ নেই।

—আমি অত সব বুঝি না। তোর যাকে ইচ্ছে তুই বিয়ে করলে আমরা আপত্তি করবো না। মোট কথা অগ্রহায়ণে বিয়ের ব্যবস্থা আমরা করছি। তোর কাউকে ঠিক করা থাকলে ভালো, নইলে

আমাদেরই দেখতে হবে। তখন কিন্তু আপত্তি করতে পারবি না বলে রাখছি। চায়ের কাপে চিনি মেশাতে মেশাতে দিদি বলে যায়,

—শীলাকে তুই দেখেছিস, ওকে যদি অপছন্দ না হয় তাহলে আমি কথা বলে দেখি। ওর মাকে দেখে ত মনে হল খুব ইচ্ছা।

চা খেতে খেতে প্রবীর হেসে বলে,

—আমাকে একটু ভাবতে দাও। তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে আমাকে বিয়ে না করিয়ে ছাড়বে না, তখন সেটা তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম। অনেক দিন সময় আছে, কাজেই এখন থেকে ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই।

—তাহলে আমি কথাবার্ত্তা সব ঠিক করে নি ?

জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে প্রবীর বলে,

—যা করবার কয়েকদিন পরে করলেই হবে।

রাস্তায় নেমেই প্রবীরের মনে পড়ে যায় কালকের ঘটনা গুলো। শীলার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে অপর্ণার এত উৎসাহ কিসের ? প্রবীরের বিয়ে হয়ে গেলে অপর্ণাকে আর অভিযোগ করা চলবে না এই কারণে ? যে কদিন অপর্ণার সঙ্গে মেলামেশা করেছে তাতে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, ও কারুর অভিযোগের তোয়াক্কা করে। তবে ? তবে কি ও প্রবীরকে পরীক্ষা করতে এসেছিল, ও অপর্ণাকে এখনও ভালোবাসে কি না। সেটা ভাবতেও যেন মন সায় দেয় না। কেননা তাহলে শীলার প্রতি ও ইর্ষান্বিতা —এটাই প্রমাণ হয়। কোন কারণই যেন খুঁজে পায় না প্রবীর। কারুর কাছে নিজের মনের সব কথা খুলে বললে হয়তো প্রবীর রেহাই পেতে পারে। অনেকের নামই মনে করতে চেষ্টা করে। এক অর্ণব ছাড়া আর কারুর কাছে যাবার কথা ভাবতে পারে না। ঠিক করে ওখানে যাবে। দেখা নাহলে চিঠি লিখে আসবে।

জায়গাটা অফিস পাড়ার উলটো দিকে বলেই হয়তো বাসে তেমন ভীড় নেই। নইলে অফিসের ভীড়ে কলকাতার ট্রামে বাসে

চড়ার কথা প্রবীর কল্পনাও করতে পারে না। দুয়েকটা ষ্টপেজ যাবার পরই ও দোতলায় বসবার জায়গা পায়। প্রবীরের মাঝে মাঝে কি হয় কে জানে। ইচ্ছে করে এমন কোথাও চলে যেতে, যেখানে পরিচিত কারুর চিঠি গিয়েও পৌছবে না। অথচ একা একা থাকলেই কেমন মনটা ছটফট করতে থাকে, পরিচিত জনের মুখ দেখবার জন্য। অকারণ অবহেলায় মনের যে কথাগুলো একঘরে করে রেখেছিল, আজ এখনই যেন মনে হচ্ছে সেগুলিকে অবহেলা করেনি সে, বরং সযত্নে লালন করে এসেছে। বিয়েই যদি করতে হয় তবে শালাকে অপছন্দ করার কিছু নেই। তবু একথা ভাবলে মনটা কেমন হয়ে যায়। সব কিছু হারিয়ে ফেলার বৈরাগ্য!

কার যেন ছায়া ছায়া আবির্ভাব শীলাব পরিপূর্ণ আবির্ভাবটাকে ঢেকে দিচ্ছে। অপর্ণার মতো জীবনটাকে খুব সহজ করে ভাবতে পারলে প্রবীর আজ রেহাই পেতো। অনেক ভেবেছে সতীত্ব কাকে বলে। কয়েক বছর আগে তার ব্যাখ্যা পেতে ওর অসুবিধা হয়নি। আজ পরিণত বয়সে তার সে ধারণা পাল্টে গেছে। মনের ওপর অভিজ্ঞতার আলো ফেলে দেখেছে, সে আলোয় দেখেছে মনের অথবা দেহের কোন কিছুরই সতীত্ব বলে কিছু নেই। শব্দটাই যেন মিথ্যে। তাহলে অপর্ণা খারাপ কিসে? তবুও না-জানি কেন অপর্ণার ক্ষণ পরিবর্ত্তিত প্রেমে অথবা ভালোবাসার জগৎটা মেনে নিতে পারে না। অপর্ণার সব কিছু মেনে নিলেও ওর কাছে আর এগুনো সম্ভব নয়। কারণ প্রেম-ভিক্ষা গ্লানিকর। তার চাইতে আত্মহত্যা অনেক সহজ। শীলা হয়তো অপর্ণার চাইতে ভালো নয়। ভালো নয় সেই অর্থে যে অর্থে অপর্ণা ভালো নয়। এটা এই কয়েকদিনের মেলামেশায় প্রবীর বুঝেছে। সুরঞ্জনের সঙ্গে যার ঘনিষ্টতার চূড়ান্ত হয়ে গেছে, সেখানে প্রবীরের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করাটা কেমন বেমানান। একজনকে সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসার পর অন্যের জন্যেও যদি জায়গার সংকুলান হয় সেই মনে,

তাহলে বুঝতে হবে বিশেষ একজনের প্রতি তার ভালোবাসা অসমাপ্ত।

বাস থেকে নেমে কিছুদূর এগিয়েই অর্ণবের বাড়ী। কলিং বেল টিপতেই চাকর বেরিয়ে আসে। অর্ণব বাড়ীতেই আছে। ড্রয়িংরুমে প্রবীরকে বসতে বলে অর্ণবকে ডাকতে যায় বাড়ীর চাকরটা। খবর পেয়েই ও চলে আসে।

—সরাসরি ওপরে চলে এলেই পারতিস। বাড়ীটা কি তোর অপরিচিত ? দিল্লী গিয়ে আর কিছু না হোক ভদ্রতা শিখেছিস বেশ।

প্রবীর অর্ণবের পেছন পেছন দোতালায় উঠে যায়। ওর ঘরের দিকে যেতে যেতে অর্ণব বলে,

—এসেছিস বেশ ভালই হল। না হলে আমাকেই ছুটতে হোত তোর ওখানে। কি যে করবো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

—কি ব্যাপার বলতো ? মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কিছু !

—প্রায় সেরকম। চা টা খা তারপর বলছি। ব্যবসা-পত্তর সব লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে। তুই যে সাত সকালে ? বেড়াতে এসেছিস বলে ত মনে হচ্ছে না। তোরও কিছু গণ্ডগোল নেই ত ?

—আছে।

—আছে ? বল কি হয়েছে।

—বলছি, আগে চায়ের কথা বলে আয়।

অর্ণব বেরিয়ে যায় চায়ের জন্যে। প্রবীর খুটিয়ে খুটিয়ে ঘরটা দেখে। এই ঘরে সে অনেক দিন এসেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে গেছে এখানে। তবু কি জানি কেন ওর মনে হচ্ছে ঘরটার পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। দেয়ালে সুন্দর ভাবে সাজানো অনেক গুলো ফটো আছে। যা ভেবেছিল তাই। অপর্ণার বেশ বড় সাইজের একখানা ছবি আছে যা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। অকারণেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। কেন ? অপর্ণার ওপর অলিখিত অধিকার ? এর কোন ব্যাখ্যাই প্রবীর দিতে পারবে না। প্রবীর

কেন, কেউই দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। অপর্ণার স্বেচ্ছাচারিতা প্রবীরের ভালোবাসাকে ঘৃণায় পর্য্যবশিত করেছে। যত উদার মনের পরিচয় দিক না কেন, ও অপর্ণাকে কোন দিনই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। অর্ণবের মানসী প্রবীরের এককালের যেই হোক না কেন. আজ তা মনে করে কষ্ট পাওয়ার পেছনে কোন সার্থকতা নেই। এই ভালো—অপর্ণা ওর নিজের পথে চলুক, আর প্রবীরও চলবে নিজের পথে। দুজনেই স্বতন্ত্র তাই দুজনেই ভিন্ন।

অর্ণব ফিরে আসে। একটু যে ব্যস্ততা, কিছু যেন অধৈর্য। টেবিলের বইগুলো অকারণে গুছিয়ে রাখে। তারপর হঠাৎ খেয়াল হয়ে যাওয়ায় ড্রয়ার থেকে সিগারেট দেশলাই বের করে দেয় প্রবীরকে। অন্যমনস্কের মত প্রবীর সিগারেট জ্বালিয়ে চুপচাপই বসে থাকে। যে পরামর্শের জন্য অর্ণবের কাছে আসা তা কেমন করে হঠাৎ অবান্তর হয়ে পড়ে কে জানে।

—তুই তো বেশ লিখতে টিখতে পারিস্। একটা চিঠি ড্রাফ্ট করে দে ত—অর্ণব বলে।

—কি চিঠি? কিসের চিঠি?

—দাঁড়া আগে একটু ভাবতে দে। ঠিক আছে। লেখ—। বেশ ভালো করে লিখবি।

—কিসের চিঠি তা বলবি তো?

—বিয়ের চিঠি। শ্রীমান অর্ণব কুমার সেনের বিয়ের চিঠি। কি করি বল ঘটকালিটা আমাকেই করতে হল। তোকে এত করে সাধলাম। যাকগে। কি লেখে—,

সবিনয় নিবেদন মিদং—

—ব্যাপারটা খুলে বলবি?

—ব্যাপারটা যে কি তা আমি নিজেই ঠিক করে উঠতে পারিনি এখনও। কাল রাত ন'টার সময় হঠাৎ অপু টেলিফোন করে

জিজ্ঞেস করে বিয়ে করতে রাজি আছি কি না। যদি রাজি থাকি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা যেন করে রাখি। এমন নার্ভাস হয়ে গেছি যে কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। যে কথাটা আমিই বলবো বলবো করে আকপাক করছিলাম, সেটাই ও দুম করে বলে বসবে আশা করিনি। মাকে জানানো দরকার। তাছাড়া আরও কি যে সব দরকার। বলনা, কি কি করতে হবে?

—শান্ত হয়ে বোস, সব ঠিক হয়ে যাবে। এসেছিলাম আমার কিছু কথা তোকে বলবো বলে। তা, তুই নিজেকে নিয়ে এত ভাবনায় ডুবে আছিস যে—।

প্রবীর অন্যমনস্ক হয়ে যায়। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় ওর। অপর্ণা অর্ণবকে বিয়ে করছে। মাঝে মাঝে যাকে শুধু ক্লেদাক্ত মনে করে ছটফট করেছে, নিজেকে অপর্ণার কবলমুক্ত ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে,—তবু কেন যেন আজ পারছে না এ বিয়েটাকে সহজভাবে মেনে নিতে।

অলিখিত অধিকারটা নীরবে হাত বাড়াতে চায় অপর্ণার দিকে। সামনের সোফাটায় অর্ণব বসে ছাদের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। এই মুহূর্তে মনে হয় অর্ণব একটা কুৎসিৎ ক্লেদাক্ত জীব। কোন রকমেই নিজের বন্ধু বলে ভাবতে পারছে না ওকে। চুরমার করে দেবে নাকি অর্ণবের স্বপ্নটাকে। প্রবীরের মতো আরও অনেকেই যে অপর্ণার সান্নিধ্যে কাটিয়েছে, বলবে নাকি সেসব? প্রবীর সে উদ্দেশ্যেই এসেছিল আজ। জীবনের ছোট্ট গ্রন্থী মোচনের সহায়তা হয়তো অর্ণব করতে পারে। প্রবীর অপর্ণাকে ভালবাসে—এ প্রখর সত্যটা অথবা অমাবস্যা মিথ্যাটা অর্ণবকে বলে ঠিক করবে শীলাকে বিয়ে করা উচিৎ না আর কাউকে। কালকে অপর্ণাকে দেখে সমস্ত আক্রোশ, যা তার মাথায় মাঝে মাঝে আবির্ভাব হোত —তা যেন কেমন মিইয়ে গেছে। কোনদিন বীভৎস দুঃস্বপ্ন দেখে প্রবীর জেগে ওঠেনি তা হলপ করে বলতে পারে না। এখনও

মাঝে মাঝে মনের কোনে সে ছায়ার চূড়ান্ত আবির্ভাবে ও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। অপর্ণার দেহের প্রতিটি কোষ প্রবীরের জানা। এ গোপন জানাটা যখন অন্যের কাছে পরিচিত, তখন ইচ্ছে করতো পশুর মতো অত্যাচারে অপর্ণার দেহটা ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে। কি জানি এটা স্বপ্ন না সত্যিই। তবে এই মুহূর্তে ইচ্ছে করছে অর্ণবের মুখটা বিকৃত করে দেয়।

অর্ণব ভাবে প্রবীরের এমন হল কেন। মুখ চোখে কেমন এক ছন্নছাড়া ভাব। মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাছাড়া এটা কোনরকমেই বুঝে বঠতে পারছে না, অর্ণবের বিয়ের কথায় যেখানে ওর খুশী হবার কথা—সেখানে নীরব অসম্মতিই যেন প্রকাশ পাচ্ছে। তাহলে কি অর্ণবের এই সুখবরটা প্রবীর ভালোভাবে নিতে পারছে না? বন্ধুর প্রতি অভিমান বশেই অর্ণব চুপ করে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে প্রবীরের ভাবান্তরের কারণ।

প্রবীর ভাবে অপর্ণার কথা, ভাবে ওর চারিত্রিক ওঠানামার কথা অর্ণবকে বলে দেয়। তারপর দেখতে ইচ্ছে করে বন্ধুর চেহারার কি অবস্থা দাঁড়ায়। ভীষণ ইচ্ছে করছে অর্ণবের সমস্ত স্বপ্নটা চুরমার করে দেয়। যেমন করে ওর নিজের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে। মদ খাওয়া অপর্ণা চ্যাটার্জি যে অনেকের দেহ এবং মনটাকেও মদে চুবিয়ে খেয়ে ফেলেছে সেটা বলা দরকার বইকি। নিজের মনে মনে তৈরী হয়ে নিয়ে প্রবীর বলে,

—কি রে, চুপ করে রইলি যে, আর কিছু বল? কবে বিয়ে হবে, বিয়ের পর কোথায় যাবি ইত্যাদি ইত্যাদি।

—বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। খবরটা শুনে কোথায় তুই লাফাবি তা না ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছিস।

—লাফাতাম, তবে একসঙ্গে লাফানো কি ঠিক হবে?

—মানে?

—মানে আবার কি। দিদি যে ভাবে চাপ দিচ্ছে, তাতে যে কোন দিন আমায় পিঁড়িতে বসতে হতে পারে।

—তাই বল। তা, মেয়ে দেখাশোনা হয়ে গেছে, না ইয়ে?

—সে জন্যেই তোর কাছে এসেছিলাম। কোথায় যেন হিসেবে আবার ভুল করে বসেছি; কিছু ঠিক করে উঠতে পারছি না। তুই চিনিস।

—আমি চিনি? কে বলতো?

—শীলা। না দেখলেও নামটা শুনেছিস নিশ্চয়ই।

—দেখালি না, নাম শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

—আসল ব্যাপার তা নয়। একটু অসুবিধায় পড়ে গেছি। আচ্ছা তুই বল—।

প্রবীর চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবতে থাকে। বেড়াতে এসে এ কেমন হয়ে গেল। জীবনের অর্থ খুজতে গিয়ে অর্থটা হারিয়ে যাবে এই ভয়ে মনের আনাচে কানাচে প্রতি মুহূর্তের যে জ্বালা, তাতে জ্বলতে জ্বলতে ভাবতে থাকে, জীবনের এটাই কি অর্থ। করুণ একটা মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরে থাকতে ভালো লাগে। কিছুক্ষণ পরে যখন বুকটা ভার হয়ে ওঠে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তখন ইচ্ছে করে এর অবসান করে। কিন্তু পারে কই।

—মনে হচ্ছে অন্য কোথাও গণ্ডগোল পাকিয়েছিস?

—তোকে সব বলবো।..........একটা মেয়েকে আমি ভালো-বাসতাম। অনেক দিন আগের কথা। তারপর বলে যায় অপর্ণার সঙ্গে তার মেলামেশার আনুপূর্বিক ঘটনা। শুধু অপর্ণার পরিচয় ছাড়া।

অর্ণব চুপচাপ শুনে যায় সব। প্রবীরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে বসে ওকে। এটাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছে যে প্রবীর একটা কাপুরুষ।

—তুই হলে কি করতিস?

—এ্যাসিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দিতাম। তুই না পারিস আমাকে বল। এমন শিক্ষা দিয়ে দেব যাতে অন্য কারুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।

—কাল আমার সঙ্গে দেখা করেছিল সে। বিয়ের পরামর্শ দিয়ে গেছে।

—কাকে ? ওকেই ?

—না, শীলাকে। শীলা ওর বন্ধু।

—এটা সহানুভূতি আদায়ের একটা চাল ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্বাস করিস না ওরকম মেয়েকে। এর জন্যে ভাববার কি আছে। বিগত দিনের কথা ভেবে কি লাভ। ওসব সারপেণ্টগুলির কথা ভেবে নিজের আখের নষ্ট করে কি লাভ তাত বুঝি না। লেখাপড়া ত ডকে তুলে দিয়েছিস তার জন্য।

চা খেয়ে তুজনে খাটের ওপর চিৎপাত হয়ে সিগারেট টানছে। প্রবীর ভাবছে অর্ণবের মার সঙ্গে ওর এখনো দেখা না করাটা ভালো দেখাচ্ছে না। তাছাড়া উঠে গিয়ে যে দেখা কবরে সে ইচ্ছেও হচ্ছে না।

—তোর কোন কাজ নেই ত রে ?

—আমার আবার কাজ।—যা বাবা এ দেখি স্বয়ং এসে হাজির হল।

সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে অর্ণব বলতে বলতে উঠে বসে। সাধারণ কৌতূহল নিয়ে প্রবীরও দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে অপর্ণা ঘরে ঢুকছে। তাহলে এখানে ওর যাতায়াত আছে। এ জানলে প্রবীর কখনো এখানে আসতো না হয়তো।

—তোমাদেব আরামটা বরবাদ করলাম তো ? কেমন আছেন প্রবীরবাবু ? অর্ণবের আপনি অন্তরঙ্গ বন্ধু অথচ ওর সঙ্গে ত কৈ আপনাকে দেখি না ? প্রাণের বন্ধুকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিয়ে নিশ্চয়ই হৈ হৈ করে ছুটি কাটাচ্ছেন ?

—তা না, অর্ণবই বরং আপনাকে নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে ওর পাত্তা পাওয়া যায় না। শুনলাম খুব শিগগিরই বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে ?

—ঠিকই শুনেছেন।

অর্ণব কোন কথার জবাব দেয় না। ওদের সহজ আলাপে বরং খুশীই হয়েছে ও। প্রবীর চেয়েছিল অপর্ণাকে আঘাত করবে চূড়ান্ত বিদ্রূপ করে। শেষ পর্যন্ত যা ও বললো, তাতে যেন ধার নেই। প্রবীরকে দেখে অপর্ণার মুখটা সাদা হয়ে গেছে। শরীরের মধ্যে কিসের এক কাঁপুনি। ভীষণ ভয় করছে কেন কে জানে। জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিয়েছে সে শুধু নিজের হাত থেকে নিজেকে রেহাই দিতে। তাছাড়া রক্তের যে তাণ্ডব নৃত্য এতদিন সে উপভোগ করে এসেছে, আজ তার কণামাত্রও আছে কি না সন্দেহ। তাই এ ফুরিয়ে যাওয়া দেহ এবং মন নিয়ে কি করে পরবর্তি সময় কাটাবে, তারই এক অযান্ত্রিক শব্দ ওকে ঠেলে দিচ্ছে কাউকে আশ্রয় করবার জন্যে। প্রবীর কি অপর্ণার সেই শেষ পাওয়াটাও ছিনিয়ে নেবে ? প্রবীরের মুখে চোখে যে রকম আক্রোশের আগুন তাতে সব পুড়ে যাবে হয়তো।

প্রবীর অপর্ণাকে দেখে চমকে উঠেছিল। খুবই স্বাভাবিক এটা। তবু মন মানতে চায়নি এই স্বাভাবিক আসাটা। অর্ণবের এ্যাসিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেবার ইচ্ছাটাই হঠাৎ প্রবীরের মনে এসেছিল। কিন্তু কেন জানি না এই মুহূর্তে ওর ঐ ফ্যাকাশে মুখটা দেখে নতুন করে সব কিছু ত্যাগ করতে ইচ্ছে করছে।

তিন জনের কথাই থেমে আছে। কারুর যেন কিছু বলার নেই। শেষে প্রবীর অর্ণবকে বলে,

—হাঁ করে বসে না থেকে চায়ের কথা বল।

একটু হেসে অর্ণব বেরিয়ে যায়।

—তাহলে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করছো ?

—কি আর করি বল। তাছাড়া তোমার কথা ফেলতে পারি না। তুমিই তো বলেছ অর্ণব ভালো ছেলে, বিয়ে করলে সুখী হব।

—তোমার সব কিছু কি ও জানে?

একটু চুপ করে থেকে অপর্ণা জবাব দেয়,

—আমায় ও ভালবাসে।

—আমি যদি সব কথা ওকে বলে দিই?

—তোমায় আমি চিনি। সে তুমি পারবে না। পারলে, অনেক আগেই তোমার বন্ধুকে সবকিছু বলে দিতে। এ ছাড়াও—, থাকগে এসব কথা। দিল্লী কবে যাচ্ছো?

—বিয়ের পর।

—কার?

—আমার। বলে, প্রবীর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে অপর্ণার দিকে। বুঝতে চেষ্টা করে এই অস্পষ্ট ছায়া টীয়া মেয়েটাকে।

চা হয়তো তৈরিই ছিল। অর্ণব চায়ের সরঞ্জাম শুদ্ধ চাকরটার সঙ্গে ঘরে ঢোকে। অপর্ণা একটু নড়ে চড়ে বসে। কেমন যেন এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা করছে না। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীরকে দেখে একটু খুশী হয়েছিল। কিন্তু এখন ওর পালাতে ইচ্ছে করছে। কাউকেই ভালো লাগছে না। কেন এমন হয় কে জানে। কোন কারণ নেই অথচ মনটা কেমন রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে। অথচ অপর্ণা জীবনের প্রত্যেক মাত্রাগুলোকে গ্রহণ করেছে খেলা হিসেবে। খেলা শেষ হলে হারলো কি জিতলো এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর আজ?

মিস্ চ্যাটার্জি, আপনাদের বিয়ের তারিখ ঠিক করেছেন? কেমন এক ধারালো হাসি হেসে প্রবীর বলে।

—না, ওসব অর্ণব জানে। কেন বলুন তো?

—দুটো বিয়ে একসঙ্গে হলে সব আনন্দই মাটী হয়ে যাবে। কাজেই তারিখটা যেন বেশ কয়েকদিনের তফাতে থাকে।

—বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে? অপর্ণার গলা অস্পষ্ট।

—হ্যাঁ। খুব সম্ভব মেয়েটাকে আপনি চেনেন।

—কে বলুন তো? প্রশ্ন করেই অপর্ণা কেমন: বিব্রত হয়ে পড়ে।

অর্ণবের মনে হয় প্রবীরের গলাটা কেমন তীক্ষ্ণ! সিগারেট টানতে টানতে অর্ণব ওদের কথা শোনে। চাটা বোধ হয় ঠাণ্ডাই হয়ে গেল।

—শীলা।

—কে শীলা?

—তিন বছর এক সঙ্গে পড়াশুনা করেছ, ঘুরে বেড়িয়েছ, তাকে আজ চিনতে পারছো না?

—কি ব্যাপার বল্‌তো প্রবীর? অর্ণব অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—ব্যাপার খুব সাধারণ। কিছুক্ষণ আগে এ্যাসিড দিয়ে যে মেয়ের মুখ পুড়িয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলি? এই সেই।

শরীরের সমস্ত কাঁপুনিটা এক মুহূর্তে প্রবীরের গলায় জমাট বেঁধে যায়, শরীরটা থর থর করে কাঁপে কি এক আক্রোশে। প্রবীরের কথা শুনে অপর্ণার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এক পলক প্রবীরের দিকে তাকিয়েই মাথাটা নীচু করে থাকে, ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠেই থেমে যায়। কেমন এক ব্যথা ভরা চোখে অর্ণব তাকিয়ে থাকে অপর্ণার দিকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঘরে যেন বাতাস ছিল না। অপর্ণা দাঁড়িয়ে আরেকবার প্রবীরের মুখের দিয়ে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে দৃষ্টিতে না ছিল কোন অভিযোগ, না প্রতিবাদ। বেশ কিছুক্ষণ পরে অর্ণবের দীর্ঘশ্বাসের শব্দে প্রবীর চমকে ওঠে। এক মুহূর্তের সংযমহীনতার জন্যে কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল কে জানে। একটু আগেও সে ভাবেনি অপর্ণাকে এরকম ভাবে আঘাত করবে। অর্ণবের সঙ্গে কোন কথা না বলে কেমন আচ্ছন্নের মত প্রবীরও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এক ঝলক বাতাসের যেন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অনুশোচনায় সমস্ত মনটা ভরে

ওঠে, অপর্ণা খারাপ, অপর্ণা নষ্ট চরিত্রা, অপর্ণা সবকিছু। তবু, তবু প্রবীর তাকে ভালোবাসে।

পাছে দিদির চোখে কিছু ধরা পড়ে তাই মুখে চারটি গুঁজে দিয়ে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে। যা হয়েছে তাত হয়েছেই। কিন্তু এ অঘটনের জন্য মনে যে জ্বালা এর হাত থেকে প্রবীর রেহাই পাবে কি করে। আজ প্রবীর তার অন্য সত্বাকে বোঝাবে যে, সে অপর্ণাকে ভালোবাসে? প্রতি মুহূর্তে শুধু অপর্ণার বিদায়কালীন মুখটা মনে পড়ছে, যাতে না ছিল ক্ষোভ, না ছিল আক্ষেপ। ভবিষ্যতে অর্ণবকেই বা কি করে মুখ দেখাবে প্রবীর? দিদি হয়তো কখনো কিছু জানবে না, তবু কেন জানি ধরা পড়ে যাবার, ভয়ে দিদির মুখের দিকে তাকাতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে কি এক দুঃসহ লজ্জা ওকে ঘরের বাইরে যেতেও সাহস দিচ্ছে না। এমনি করেই কাটিয়ে দিল কয়েকদিন। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করে আবার পালিয়ে যাবে দিল্লী।

জীবনটা কি, এ ভাবনা একদিন না একদিন মানুষের মনে আসেই। অবশ্য তার ভেতর যদি চিন্তা করার প্রবণতা থাকে। জীবনের হাটে বিকি কিনি করতে করতে যখন সায়ংকালে ঘরে ফেরে তখন একবার হিসেব করতে ইচ্ছে করে বৈকি আয় কত হল আর ব্যয়ই বা কত।

বাবা বেরিয়ে যাবার পর দুটো খেয়ে অপর্ণা শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে। সেদিন প্রবীরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে আজ প্রায় পাঁচদিন ধরে অপর্ণা ঘরে বসে আছে। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার আনন্দটা যেন কখন কোন সময় অদৃশ্য হয়েছে। শরীরে এক ক্লান্তি। মনে হয় অনেকদিন অসুখে ভোগার পর সদ্য পথ্য নিয়েছে। ইচ্ছে করে একবার তলিয়ে দেখতে পেছনের পেরিয়ে আশা পথটুকু। অনেক ছবিই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। সব চাইতে স্পষ্ট বাবার মুখটা। অপর্ণা বোঝে বাবার দুঃখ কোথায়। মায়ের জন্য এক ভীষণতম জ্বালা এখনও বয়ে চলেছেন। একেই সত্যিকার প্রেম বলে কিনা কে জানে। ওর ধারণা দেহের ভালো লাগাটা হয়তো প্রেম নামক বস্তু।. দেহের চাহিদাটা মনের ওপর প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্র সব বর্ণ গন্ধের রূপ নেয়। তবে আজ কেন তার দৈহিক আনন্দের প্রতি অনাস্থা? কেন ক্লান্তিতে সমস্ত মনটা ছেয়ে আছে? অর্ণব এসে ওকে চাঙ্গা কররার চেষ্টা করেছে। অথচ কেন জানি অর্ণবের কাছ থেকে কোন উত্তাপই পায়নি।, যখনই গলা ভেজাবার প্রয়োজন হয়েছে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর সঙ্গে বেরিয়েছে। প্রথম প্রথম মদ খাওয়ার পেছনে ও একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। সেটা ভোলবার। মায়ের প্রতি এক সীমাহীন অভিমান। কাঙাল মন খুজে পেতে চেয়েছিল মায়ের স্নেহ। কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল। বাবার একমাত্র আশা ভরসা ও। অথচ বাবাকে ও সহ্য

করতে পারছে না। মানুষটা এমন নির্জীব স্তব্ধ যে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে ইচ্ছে করে। আরেকটা বিয়ে যদি করতেন তাহলে ওর অন্ততঃ আরও দুয়েকটা ভাই বোন থাকতো, তাদের নিয়ে কাটাতে পারতো, এতটা ভার অনুভব করতো না। তা না, দুজনের সংসার। যাতে মান অভিমান ঝগড়া ঝাটির কোন লক্ষণ নেই। তাইতো বাবাকে ক্ষেপিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বাবার অমনোনীত কাজ করে। অথচ কি আশ্চর্য মানুষ, জেগে ওঠার চাইতে গুটিয়ে গেছে অনেক বেশী।

এমনি আরেক জনের কাছে ও হেরে গেছে। সে প্রবীর। ঠিক বাবারই মত। ঝড়ের বেগে অপর্ণার জীবনে এসে যেন জগদ্দল পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। এক ঘেয়েমীতে পেয়ে বসলো ওদের দুজনের সম্পর্ক। তাই ও চেয়েছিল ইর্ষার আগুনে ওকে পুড়িয়ে খাঁটী করে নেবে, কিন্তু ফল হল উল্টো। প্রবীর হারিয়ে গেল ওর জীবন থেকে। ভীষণ অভিমান হয়েছিল ওর ওপর। অপর্ণা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল দেহটাকে ডিঙ্গিয়ে ভালোবাসার চেহারা দেখতে পায় কিনা। প্রবীরও তার দেহটাকে ভালোবাসে। নইলে সেই দেহের উপর অন্যের হাত পড়লে ওর রাগ করার ত কোন কারণ নেই। ওর মনের ওপর ত কেউ হাত দেয়নি যেটা তোলা ছিল প্রবীরের জন্য।

জীবনের এক একটা বাঁকের মুখে অনেক মুখের ভীড়। তাদের কারুর কারুরটা একটু উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বল মুখের মধ্যে যে উজ্জ্বলতর একজন থাকতে পারে এটা প্রবীর বুঝতে চাইলো না। পরিতোষ এসেছে। পরে পরে এসেছে আরও কিছু সুরঞ্জন, বোস, অর্ণব—হয়তো আরও কেউ। হয়তো তারা একেক জন অপর্ণার জীবনে ঋতু পরিবর্ত্তন। কিন্তু, কিন্তু প্রবীর অপর্ণার জীবনে একটা পরিপূর্ণ বছর, সব বছরগুলোর প্রতিনিধি। চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। ইচ্ছে করে সমস্ত জমানো চোখের জলগুলো একসঙ্গে বের করে দেয়।

কেউ ত দেখতে পাবে না যে অপর্ণা কাঁদে, কাঁদতে জানে। বাবার কত ইচ্ছে অপর্ণা বড় হবে। কি করে মানুষ বড় হয়, আর বড় হওয়া কাকেই বা বলে? জন্মাবার পর যার শেকড় মাটী ছোঁয়নি, তার বেঁচে থাকাই ত অসম্ভব। তার আবার বড় হওয়া। কি অদ্ভুত স্বার্থপর এই প্রবীরটা। নিজে সন্তুষ্ট হতে পারেনি বলে অপর্ণার শেষ আশ্রয়টি ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। প্রবীর ভালোবাসে? সব বাজে। ‹কেউ কাউকে ভালোবাসে না এ পৃথিবীতে। নিজেকে ভালোবেসেই মানুষ ফুরিয়ে যায়।› অন্যকে টেনে আনে শুধু নিজের ভালোবাসা আস্বাদন করবার জন্যে। আজ মনে হচ্ছে ওর মা ঠিক কাজই করেছেন। অন্যকে ভালোবাসি এই মিথ্যের আশ্রয় না নিয়ে নিজেকেই পরিপূর্ণ ভাবে পেতে চেয়েছেন। মন যা চায় তাই করাই বিধেয়। ‹শরীর তৃপ্ত হলেই মন তৃপ্ত। মনের তৃপ্তিই শরীরের পুষ্টি। দুইই দুয়ের পরিপূরক।› কিন্তু তাই যদি হবে, তবে প্রবীরের এই নৃশংস অপমান অপর্ণার উর্মিমুখর জীবনটাকে এক নিমেষে স্তব্ধ করে দিল কি করে?

ভীষণ ইচ্ছে করে প্রবীরের কাছে ছুটে যায়; প্রতিশোধ নেয় হিংস্র ভাবে। পারে না। কিসের এক আত্মমর্য্যাদা বোধ ওর গতি রোধ করে আছে। অর্ণব ওকে ভালোবাসে! কি বিচিত্র এই পুরুষগুলোর ভালোবাসা। ‹দেহের স্পর্শ পাওয়ার আগে কি বিচিত্র রঙের সব বেলুন ফোলাবে শুধু দেহের স্পর্শ পাওয়ার লোভে।› "তুমি আমার সব, তোমায় ছাড়া বাঁচতে পারবো না" কত কি। অথচ যখনই শুনলো অন্য কেউ আগেই স্পর্শ পেয়েছে সেই দেহের, সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার বেলুন চুপসে গেল। অর্ণব কি এতটুকু সাহস দেখাতে পারে না অপর্ণাকে গ্রহণ করে? তা নাহলে প্রবীরের প্রতি প্রতিশোধ নেবে কেমন করে? চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে "অর্ণব একবার, এসে বলো যে তুমি আমায় ভালোবাসো তাহলে মুহূর্তে তোমার ভালো না লাগাটা একমুহূর্তে ভালো

লাগায় পরিণত হবে।" নিজের মনেই হেসে ওঠে অপর্ণা, ওর ছেলে মানুষী চিন্তা দেখে।

মায়ের একটা ছবিও ঘরে রাখেনি বাবা। ছবিটা থাকলে মার সঙ্গে কোথায় কোথায় মিল কোথায় অমিল মিলিয়ে দেখতো। দুবার দেখা মুখটা মনে করার চেষ্টা করলেই কেমন আবছা হতে হতে এক সময় মিলিয়ে যায় (কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে চোখটা বুজে ফেললে সেই জিনিষটাকে আবছা আবছা কিছুক্ষণ দেখা যাবার পরই অদৃশ্য হয়ে যায় কতগুলি আলোক বিন্দুতে)—অনেকটা তেমনি। বাবাকে রোজ দেখে বলে ওঁকে দেখার তেমন আগ্রহ নেই। মাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। তরঙ্গহীন এই সময়টুকুতে ভীষণ ইচ্ছে করে কারুর বুকে আশ্রয় নিতে, যেখানে শান্তি আছে, নির্ভরতা আছে। মার কথা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে যায় মাকে দেখবার ঘটনাটা।

এমনি এক অলস মধ্যাহ্নে অপর্ণা চুপচাপ শুয়েছিল খাটে। শরীরটা ভাল ছিল না তাই কলেজ যায়নি।

বাবা কলেজে চলে গেছেন তাই বাড়ীটা ফাঁকা। শুয়ে শুয়ে প্রবীরের কথা ভাবছিল। ভেবে পাচ্ছিল না প্রবীর কাউকে কিছু না বলে চলে গেল কোথায়। অঘটন কিছু নয় তো? কিছু করে বসাও ছেলের পক্ষে অসম্ভব নয়। নিজের প্রতি কেমন রাগ হচ্ছিল সেদিন। কেন যে সেদিন নির্মমভাবে ছেলেটাকে আঘাত করেছিল কে জানে। প্রফেসার বোস! ভালোই লাগত, লোকটাকে। ঝড়ের মতো এসে অপর্ণার সব কিছু ওলট পালট করে দিয়েছিল। প্রবীর যদি বুঝতো, ও যদি শক্ত হাতে অপর্ণাকে ধরে রাখতো, এমনি সব আবোল তাবোল ভাবছিল। প্রবীরের গল্পের খাতাটা বের করে কোন একটা গল্পের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। লেখার হাতটা বড় মিষ্টি। তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ক্রূর সম্পর্ক বা মিথ্যা আদর্শবাদ এগুলোকে ওর ভালো লাগতো না।

চাবুকের মতো লিখতে পারে না কেন প্রবীর? হয়তো কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব।

প্রবীরের লেখার কথা ভাবতে ভাবতে বাবার লেখা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। হঠাৎ মনটা চাঙা হয়ে ওঠে। বাবা বাড়ী নেই, তাই সব জায়গাগুলো খুজে দেখতে পারবে। বিশেষ এক উত্তেজনা নিয়ে এখানে সেখানে খুঁজে বেড়ায়। দুয়েকটা পুরনো ম্যাগাজিন জোগাড় করে। বাবার নির্দিষ্ট ড্রয়ার, যেটা সব সময় বন্ধই থাকে, একটু চেষ্টা করেই সেটা খুলে ফেলে। বেশ মোটা একটা খাতা পেয়ে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে বিছানায় এসে বসে। অনেক লেখা। হয়তো পাথরের মতো মানুষটাকে জানা যাবে এই খাতার পাতায়। এক সঙ্গে এত বছর কাটিয়ে আসা সত্ত্বেও বাবাকে যেন পরিপূর্ণভাবে, চিনতে পারে নি অপর্ণা। হয়তো চিন্তাধারার পার্থক্য তাই।

খাতাটা ওলটাতে ওলটাতেই একটা নীল খাম বেরিয়ে পড়ে। অন্যমনস্ক ভাবেই খামেব ভেতর থেকে ছোট্ট চিঠিটা বের করে পড়ে ফেলে। অবাক হয়ে যায় অপর্ণা। ওর মা তাহলে মরে নি। অথচ আশ্চর্য উপায়ে ওর বাবা এতদিন বুঝিয়ে এসেছেন যে, ওর মা মরে গেছে। যুক্তি দিয়ে বিচার করার চেষ্টা না করেই কেন যেন বাবার উপর ভীষণ অভিমান হয়। মনটা খুশীও হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। যাক, মা তার বেঁচে থাকার অর্থ খুজে পেয়েছেন। বাবার কথা, অন্যান্য পরিচিতদের কথা ভুলে গিয়ে, মার কথাই শুধু ভাবতে থাকে। তন্দ্রাহীন কোন মুহূর্তে মা নাম্নী যে মহিলাকে ও কল্পনায় দেখেছিল তাকে আবার মনে করার চেষ্টা করে। কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব কিছু। নিজের মুখটা আয়নায় দেখে নেয়। মা কি ওর মতো দেখতে না অন্য রকম? বাবার মুখটাই শুধু চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

চিঠি থেকে ঠিকানাটা টুকে নেয়। সাধারণ কাপড় চোপড় পরে

দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঠিকানা খুজে পেতে ওর খুব কষ্ট হয়নি। বাড়ীর সামনে অনেক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছে। সাহস পায়নি ভেতরে যাবার। কেন যাবে, আর কি পরিচয়ই বা দেবে সেখানে। রাস্তার ওপর এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকার দরুণ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পথচারীর দৃষ্টিকে অপর্ণা আমল দেয় না কখনও। বরং ওদের গোপন ইচ্ছায় খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করতে ওর ভালোই লাগে। ঢুকবে না যখন ভাবছে সেই সময় একটা কালো রঙের গাড়ী এসে গেটের কাছে থামে, প্রায় অপর্ণার গা ঘেঁসে। দরজা খুলে এক ভদ্রমহিলা গাড়ী থেকে নামেন। হাতটাকে আলতো ভাবে নেড়ে গাড়ীর ভদ্রলোককে বিদায় জানাতে গাড়ীটা ব্যাক করে চলে যায়। গাড়াটা চলে যেতে অপর্ণার দিকে মুখ ফেরান। চোখের দৃষ্টিতে কেমন অবস্থা। অপর্ণা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওব পরিচিত কেউ দেখলে সেটা বিশ্বাস করতো না।

—কাকে খুজছো ?

মনে মনে অপর্ণা বলে, "তোমাকে"।

—আমি তামসী দেবীকে খুঁজছিলাম। ইচ্ছে করেই 'দেবী' ব্যবহার করেছে ও।

—আমিই। কি দরকার ?

একটু ইতস্তত করে অপর্ণা পায়ে হাত দেবার জন্যে হাত বাড়ায়। কেমন যেন সভয়ে পেছনে সরে গিয়ে বলেন,

—তোমায় ত চিনলাম না ?

অপর্ণা জড়তা কাটিয়ে উঠেছে। মুখটাকে কঠিন করে বলে,

—আমার নাম অপর্ণা চ্যাটার্জি ; চেনেন ?

এখনও অপর্ণার পরিষ্কার মনে পড়ে মা'র মুখে যেন কিসের ছায়া। সে ছায়ার রঙ কি কে জানে।

—আমার কাছে কেন এসেছ, কি চাই ?

—আপনাকে দেখতে। একটা বাচ্চা মেয়েকে ফেলে আসতে পারে যে মা তাকে একটু না দেখলে মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। আপনারই লেখা ছোট্ট একটা চিঠিতে জানতে পারলাম আমার মা মরেনি। তাই দেখতে এলাম আমার মা কেমন।

তামসীর সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অপলক চোখে তাকিয়ে দেখছে অপর্ণাকে। মেলাবার চেষ্টা করছে সেই রবারের পুতুল কোলে নিয়ে বসে থাকা মেয়েটার সঙ্গে। কোথায় যেন মিল আছে অথচ কোন মিল নেই।

—আরেকদিন দেখা করো। আজ আমার শরীরটা ভালো নেই।

একটু আগে বাবার সম্বন্ধে অপর্ণা যা ধারণা করেছিল, এক্ষুণি তা' পর্য্যবশিত হল অসীম করুণা আর ভালোবাসায়। কাছে না থাকা মানুষটার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় মনে মনে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ওর। তারই শব্দে চমকে দেখে ওর মা সামনে নেই। মাথা নীচু করে বাড়ী চলে আসে। মা'র কথা ভেবে আর কখনো সময় নষ্ট করেনি।

আরেকবার দেখেছিল মাকে। হয়তো সেটা শেষবার। প্রবীর চলে গেছে, প্রফেসর বোস কাছে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। জীবনের সমস্ত উৎসগুলো যেন বেমালুম বুজে গেছে প্রফেসর বোসের উত্তাপে। রক্তের সেই নাচন থামাতে কিনা কে জানে, বিয়ে করতে সম্মত হয় অপর্ণা। সেই সম্মতির মর্যাদা রাখার জন্যে বোস ওকে নিয়ে যায় ওদের বাড়ীতে। গাড়ীটা গেটের কাছে আসতেই অপর্ণা চমকে ওঠে বাড়ীটা দেখে। এই বাড়ীতে ওর মা তামসী থাকে। বোসকে গাড়ী থামাবার কথা বলতে বলতেই গাড়ী পোর্টিকোর তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। গাড়ীর শব্দেই সম্ভবতঃ তামসী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বোস অপর্ণার কানের কাছে মুখটা এনে বলে, "আমার বৌদি"। তারপর আর কিছু মনে করতে পারে না অপর্ণা। শুধু এটুকু মনে আছে যে, কারুর দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল

বাড়ী থেকে। আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে হাঁটতে হাঁটতে অনেক রাতে বাড়ী ফেরে।

কলিং বেলটা ওর অলস মনের পায়চারিটা বন্ধ করে দেয়। কে এলো কে জানে। পাড়ার কোন দুষ্টু ছেলেও হতে পারে। আবার বেজে ওঠে বেলটা। কে জানে বাবা হয়তো কলেজ পালিয়েছেন। তাছাড়া আর কে হবে। কয়েক দিন আগে হলে ভাবতো অর্ণব এসেছে। আজ আর তা ভাববার কোন কারণ নেই। প্রবীর এক ফুৎকারে নিবিয়ে গিয়েছে অপর্ণার অবশিষ্ট ক্ষীণতম আলো। এলানো শরীরটা টানতে টানতে নিয়ে চলে। আস্তে আস্তে বন্ধ দরজাটার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করে আবার বেল বাজে কিনা দেখবার জন্যে। ওপাশে কারুর উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে না। তবে কি কেউ এসে চলে গেল নাকি? অর্ণব এসেছে কি? না, না. অর্ণবকে আর ও সহ্য করতে পারবে না। একটা কাপুরুষ। প্রবীরের কথা শুনেই ভালোবাসার ফানুষ ফুটো হয়ে গেছে। খিল খুলে দরজাটা ফাঁক করতেই দেখে প্রবীর দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে অপর্ণা। এ সময় যাকে খুশী কল্পনা করা যায়—এক প্রবীরকে ছাড়া। মনটা কেমন আনন্দে আর ভয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এসো?

—মাষ্টার মশাই বাড়ী আছেন? হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অযথাই প্রশ্ন করে প্রবীর। ঘড়ি দেখেই বুঝেছে যে এখন মাষ্টার মশাইয়ের থাকার কথা নয়। অথচ ওর মনে হয়েছিল বেলা যেন শেষ হয়ে এসেছে। এখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সবে বেলা তিনটে। অপর্ণার চোখে কি—জল না আগুন? প্রবীর তাকাতে পারে না ওর মুখের দিকে।

—চল, ভেতরে চল। বাবার আসতে এখনও দেরি আছে। প্রবীর ভেবে পায় না কি করবে। সেদিনকার সে আঘাতের পর থেকে নিজেকে কত ছোট মনে হয়েছে প্রবীরের। তাই সংকুচিত মন

নিয়েই অপর্ণার পেছন পেছন দোতলায় উঠে যায়। যেতে যেতে অপর্ণা বলে,

—অনেকদিন পর এবার যখন তোমায় প্রথম দেখলাম, সেদিন থেকে ভেবে এসেছি তুমি আসবে। কি ছেলে মানুষ তুমি প্রবীর, আমার ওপর রাগ করে আমার বাবার সঙ্গেই দেখা করলে না। অথচ তোমায় উনি কত ভালোবাসেন।

—সে জন্যেই ত এলাম। তুমি আজ ঘরে! প্রশ্নটা করে সরাসরি অপর্ণার মুখের দিকে তাকায়। এ অপর্ণাকে সে কখনো দেখেনি। একটা সাধারণ শাড়ীকে অতি সাধারণভাবে পরা, চুলগুলি আলুতো ভাবে খোঁপা করে বাঁধা, চোখের কোলে কালি। অসুখ করেনি ত? যা চাপা মেয়ে, জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলবে 'ও কিছু না'। আগের কথাটার জের টেনে অপর্ণা বলে,

—আমি না থাকলে তুমি খুশী হতে—না?

—খুশী হতাম কিনা তলিয়ে দেখিনি। শুনেছিলাম সারাদিন বাইরে বাইরেই থাকো, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

বড় ঘরটায় দুজনে এসে বসে।

—তোমার কাছে একবার আসার তাগিদ অনুভব করছিলাম।

—কেন?

—বলতে পারো, ক্ষমা চাওয়ার জন্য। সেদিনকার ঘটনার জন্য—, মানে সত্যিই আমি অন্যায় করেছি তোমাদের দুজনের কাছে। অর্ণবের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। শুনলাম পরশুদিন ও কোথায় বেড়াতে গেছে। তারপর এলাম তোমার কাছে।

—কবে যাচ্ছো?

—কেন, না গেলে তাড়াবে নাকি। হেসে বলে প্রবীর।

—সে সাধ্য আমার নেই। তবে সেদিনের ঘটনার পর আজ তোমার আসার ঐ একটি কারণই আমার মনে হয়েছে। ভালো কথা, বিয়ে না করেই যাবে?